পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক

শক্তি-সঞ্চয়।

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী
প্রণীত।

কলিকাতা ২৩ নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র দে দ্বারা
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩৭। খৃষ্টাব্দ ১৯১৫।

মূল্য ১।৹ দেড় টাকা মাত্র
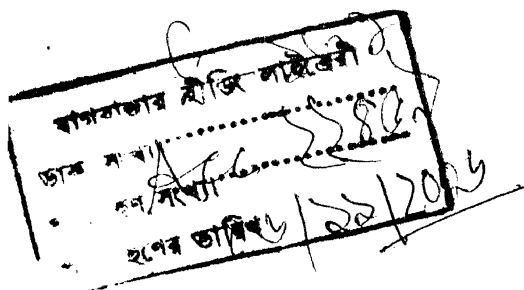
উৎসর্গ।

বাল্যকালে যাঁহার স্তন্য অমৃত ধারার ন্যায় আমার হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে পবিত্র শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে—আমার জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, যৌবনে যাঁহার অমর-আশীর্ব্বাদ মানবের অসীম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সম্পদে বিপদে আমাকে অনন্ত শক্তি প্রদান করিতেছে, যাঁহার অমিয় মাখা অকৃত্রিম স্নেহ-বাক্য সংসারে আমার অচ্ছেদ্য বন্ধন, মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা সেই মাতৃ দেবীর শ্রীচরণে অকৃতি সন্তানের ক্ষুদ্র কুসুমাঞ্জলি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।

রঘুনন্দন।

"সেবাব্রত জীবনের সর্ব্বোচ্চ সোপান
মিলে তথা প্রেম-ভক্তি অমূল্য রতন।"

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী।

অবতরণিকা।

মানবের প্রাণের ন্যায় মানবজাতিরও একটী প্রাণ আছে; আমরা তাহাকেই জাতীয়-জীবন বলি। কর্ম্মহীন মানব যেমন জড় বা মৃতবৎ হয়, জাতীয়-জীবনও কর্ম্মহীন হইলে তেমনি হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ম্মই মানবকে এবং মানবের জাতিকে জীবন্ত করিয়া রাখে। যে জাতির মধ্যে তাহার অভাব হয়, সে জাতি এবং তাহার সমাজ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়।

সমাজ জাতীয়-জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্র। সমাজস্থ বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে ব্যবহারগত বা কর্ম্মগত পার্থক্য স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক পার্থক্য নিবন্ধন সময়ে সময়ে কর্ম্মগত বিরোধ উপস্থিত হইয়া জাতিকে বা সমাজকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। যাহাতে সে পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান হয়, তাহার জন্য এক-লক্ষ্যাভিমুখী কোন মৌলিক কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রচলন থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই জাতীয়-জীবন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে সমর্থ হয়। যে সমাজে যে জাতির মধ্যে এই প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি অক্ষুন্নভাবে পরিচালিত হইতে পারে, সেই সমাজ এবং সেই জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

যে কর্ম্ম-পদ্ধতি বহুধা বিভক্ত আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আর্য্য সমাজকে অটল অদ্রির ন্যায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আর্য্যজাতিকে উন্নতির শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করাইয়া অমর-গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিল, বহু

জাতির এক লক্ষ্যাভিমুখী সেই কর্ম্ম-পদ্ধতি, আর্য্যজাতি বর্ণাশ্রম-বিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আধুনিক আমরা প্রাচ্য-শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া সেই শক্তির ভাণ্ডার আশ্রম-ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম-পদ্ধতি হারাইতে বসিয়াছি; তাই আজ আর্য্য-সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অনন্ত অভাবে উৎপীড়িত হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে ধ্বংস-লীলার বিভীষিকা দেখিয়া চমকিত হইতেছে।

ধর্ম্মই মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। ধর্ম্ম কর্ম্মাশ্রিত, কর্ম্ম গুণাশ্রিত, গুণসমূহের পার্থক্য নিবন্ধন কর্ম্মেরও শ্রেণীগত বা স্তরগত পার্থক্য স্বাভাবিক। গুণ ও কর্ম্মের এই প্রকার পার্থক্য হেতু মানবের বর্ণভেদও স্বাভাবিক। বিভিন্ন বর্ণের (জাতির) বিভিন্ন কর্ম্ম যেখানে পূর্ণতররূপে প্রস্ফুট হইয়া শ্রান্তি লাভ করে, তাহাকে আশ্রম বলাযায়। আশ্রমের কর্ম্ম-প্রণালী গুলিকে আশ্রমধর্ম্ম কহে : আশ্রমধর্ম্মও স্বাভাবিক। আর্য্যজাতির মৌলিকত্ব (বিশেষত্ব) এই যে, তাঁহারা মানব-কপোল-কল্পিত বিধানকে উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক বিধান আশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যদিয়া আপনাদিগকে উন্নীত করিতে প্রয়াস পাইতেন।

কর্ম্ম সাধনই হউক বা ধর্ম্ম সাধনই হউক, ব্রহ্মচর্য্য সাধন উহার মূলভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষিত জীবনে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম-শক্তি প্রস্ফুট হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে হইলে আশ্রম ধর্ম্মের বিধানগুলি প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হইয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত এবং শক্তিশালী হইতে

পারে; অধিকন্তু উহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হইয়া মানব জীবনের চরম লক্ষ্য প্রেমের উদয় হয়।

মানুষে চাহে অবিরাম সুখ—অবিরাম আনন্দ। উহা প্রেমের ফল। মানুষ তাহা ভুলিয়া যাহা তাহা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল সাজে, ধ্বংস হইতে বসে; তাই এতদুঃখ—এত অভাব।

বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-শক্তি হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, সুখ-শান্তি হারাইয়াছে, পতনমুখে অগ্রসর হইতেছে। আর্য্য সমাজকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী করা সাধারণশক্তির সাধ্যায়ত্ব নহে। যে শক্তির আকর্ষণ প্রভাবে কোন মহাশক্তিধর অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাচার-কলুষিত পিচ্ছিল সমাজ-ক্ষেত্রে শিথিল-শক্তি পতনোন্মুখ জাতিকে হাতে ধরিয়া রাখিতে পারেন, সেই প্রকার পবিত্র শক্তি সঞ্চয় হইতে পারে যে প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি আচরণ করিলে, এই গ্রন্থে তাহাই আলোচিত হইল। ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার অব্যবহিত পরেই আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন মাতৃ দেবী পরলোক গমন করায় নানা প্রকার মানসিক অশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি। এজন্য নিজে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিনাই বলিয়া মুদ্রণ কার্য্যে নানা প্রকার ত্রুটী হইয়াছে। বিশেষতঃ সুন্দররূপ ভ্রম সংশোধন করা হয় নাই। আপাততঃ সংস্কৃত শ্লোকের ভ্রম সংশোধনের জন্য একটী সংশোধন পত্র দেওয়া হইল। বাঙ্গলা অংশে যে দুই চারিটী ভ্রম দৃষ্ট হইবে, পাঠক বর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে ত্রুটী এবারের জন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশক।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৩	৮	মাংসাত্ত	মাংসাত্তু।
১০১	৪	ততোহহঙ্কার	ততোঽহঙ্কার।
১২৮	১	তাসমাদ্যা	তাসামাদ্যা।
”	৬	সমেহপুমান্	সমেঽপুমান্।
”	৮	ব্রহ্মচর্য্যেব	ব্রহ্মচার্য্যেব।
১৭৪	১২	চিঞ্চয়েৎ	চিন্তয়েৎ।
১৮৭	৬	ক্রোধস্তথো	ক্রোধস্তথা।

সূচীপত্র।

শক্তি-সঞ্চয়।

প্রথম অধ্যায়।

গুরু ও শিষ্যে।

গঙ্গাতীরস্থ বাঁধা ঘাটের একটী সোপানের একধারে বসিয়া প্রগাঢ় চিন্তা-নিবিষ্ট দয়ানন্দ কি ভাবিতেছিলেন। কলনাদিনী খর প্রবাহিনী গঙ্গা-বক্ষ-বিক্ষোভিত বীচিমালা, বহিত্র বাহিত তরণীরাজি, শীকর-সম্পৃক্ত সান্ধ্য-সমীরণ, সুকোমল সুশ্যামল কিশলয় শোভিত পাদপশ্রেণী কিছুতেই তাঁহার নয়ন নিবদ্ধ নহে। তাঁহার অবিচলিত দেহ, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিস্ফুরণশীল সুবিস্তৃত নয়নযুগল দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন এক অজ্ঞাত নিবাসের অনির্ব্বচনীয়—অভাবনীয় বিষয়ের আলোচনায় তদীয় হৃদয় পরিপূর্ণ; পার্থিব বিষয়ের

বিন্দুমাত্র ও তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতেছে না। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার বিস্তৃত নয়নদ্বয় ঈষদূর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নীল নভোমণ্ডল বিরাজিত নক্ষত্র নিচয়ে স্থাপিত হইল। স্বামী দয়ানন্দ উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে মৃদুমধুর স্বর্গীয় স্বর লহরী ঢালিয়া গাহিলেন,—

বিজন বিপিনে যমুনা পুলিনে
আর কি বাশরী বাজিবে না।
আর কি শ্যামের মোহন মাধুরী
হেরিয়া যমুনা নাচিবে না।

আর কি শ্যামের মুরলীর রবে
তটিনী উজান বহিবে না।
(আর কি) মধুকর কুল হইয়ে আকুল
গোকুল চাঁদেরে চাহিবে না।

আর কি ভারত তব হীন ভাগ্যে
সেদিন উদয় হইবে না।
আর কি তোমারে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
মা ব'লে আবার ডাকিবে না।
জ্ঞানের আলোক ছুটিবে না,
মা তোর দুঃখ ঘুচিবে না।*

সঙ্গীতের স্বরলহরী ও ভাবমাধুর্য্যে অদূরে উপবিষ্ট শিষ্য যোগজীবনের হৃদয় ভরিয়া গেল; তিনি বাষ্পরুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "নিশার স্বপন সম সে সুখ কাহিনী" শুনিলেও প্রাণ

---

* ভৈরবী মিশ্র।

কেমন করিয়া উঠে। জানিনা ভারতের ভাগ্যে আবার সে শুভ দিনের প্রত্যাবর্ত্তন হইবে কি না।

দয়া। হইবে,—একবার যাহা হইয়াছিল আবার তাহা হইবে। চাহিয়া দেখ, পূর্ব্বদিগ্বিভাগে ঈষদ্রক্ত-রঞ্জিত রেখা নিচয় নিশাবসানে উষা সুন্দরীর প্রতিকৃতিরূপে আদিত্যদেবের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। যোগজীবন! তোমরা যুক্তকরে মুক্তহৃদয়ে ঐ বিভাবসুর অভিনন্দন পাঠ কর। দেখিবে, যখন ঐ প্রভাকরের খর কিরণরাশী মধ্যাহ্ন-গগনে বিকীর্ণ হইবে, তখন সেই কিরণ প্রভাবে ভারত-বক্ষে আবার সেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, দক্ষ, গৌতম, কপিল, কণাদের জ্ঞানচক্ষু জ্বলিয়া উঠিবে; আবার—আবার সেই ভারতীয় সামগানের পবিত্র স্বরলহরীতে দিগন্ত-ধ্বনিত হইবে।

যোগ। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল জগতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা সংঘটিত হইয়া কালচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত প্রায়, জানিনা—কোন মহাশক্তি-ধর সেই অমূল্যরত্নরাশিকে অতলস্পর্শী কালগর্ভের তলদেশ হইতে পুনরুত্তোলন করিবেন। জানিনা হৃতসর্ব্বস্বা হতভাগিনী ভারতমাতার ভাগ্যে সেই শুভদিনের উদয় কতদিনে হইবে।

দয়া। নিশান্তে দিবা যেমন স্বভাব-শক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তেমনি দুঃখান্তে সুখ বা অবনতির পরিবর্ত্তনে উন্নতির প্রবর্ত্তন স্বভাব-শক্তির অদমনীয় পরিণাম। সংসার চক্রের গতি নিয়ামক যন্ত্রস্বরূপ উন্নতি ও অবনতি দুইটী কথা লইয়া ক্রম পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া জগৎ

যুগান্তরকালাবধি আপনার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। জগতের যে দিকে চাহিবে ইহাই দেখিবে। আজ যেখানে গগনস্পর্শী সৌধ-শিখরে বিজয় পতাকা উড়িতে দেখিতেছ, কাল সেখানে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে পেচক কুলের কর্ণ-বধির কলরব শুনিয়া বিস্মিত হইবে। আবার আজ যে ঐ নীলাম্বু-নিধির ভৈরব আরব তরঙ্গাভিনয় দেখিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে চমকিয়া উঠিতেছ, কাল সেখানে নীররাশির গর্ভোত্থিত বালুকাস্তূপের উপরিভাগে নয়নাভিরাম মনোহর নগর দর্শনে বিস্মিত হইবে। যে শক্তির দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে এই প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, সেই মহীয়সী শক্তির প্রবল প্রভাবে ভারত ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিক যদি অভাবের অনুভবে তোমাদিগের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তবে সেই দুঃখ-ভারহারী শ্রীহরির শ্রীচরণে শরণ লইয়া বল,—

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

যে দয়ানিধি প্রলয় পয়োধিরাশি উদ্ভেদ করিয়া বেদ আহরণ পূর্ব্বক ভারতীয় আর্য্য সন্তানের জিহ্বাগ্রে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে আর্য্যসন্তানগণ সামগানের গৌরব-গাথায় দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, সেই মহীয়ান শক্তিধর মহামহিমাময় মহাপুরুষ তোমাদিগের সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া

ভারতভাগ্যে আবার শুভদিনের উদয় করিবেন। তিনি যে কৃপাপারাবার ভূভারহারী ভক্তের ভগবান।

যোগ। মানব মাত্রেই চিরকাল অপূরণীয় অভিলাষ রাশী হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাহার সম্পূরণাকাঙ্খায় পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করে। যদি মানবের ইচ্ছা মাত্রেই সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ঐশীশক্তির অনুগ্রহ সম্ভব হইত, তবে মানুষ কি কখন দুর্ব্বিষহ দুঃখ-জ্বালা ভোগ করিত?

দয়া। জীব জগতের চরম উন্নতি মানব জীবনে সম্ভব হইবে না এমন কিছু এ জগতে নাই। মানব ইচ্ছা করিলে কিনা করিতে পারে! বোধসত্ত্বের বিকাশ-ক্ষেত্র মানব-হৃদয় কুকর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হইলেই মানব আত্ম-শক্তি হারাইয়া আপনাকে বিস্মৃত হয়। নতুবা মানবের অঙ্গুলি সঙ্কেতে গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে, বালুকাস্তূপ পর্ব্বতে পরিণত হইতে পারে। নদী-মেখলা শস্য-শ্যামলা হিমাদ্রিশেখরা শুভ্রফেনোর্ম্মি সাগরাম্বরা আধ্যাত্মিকতার তপোবন সাধকের সাধন-ক্ষেত্র ভারত মাতা, যে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও ভক্তিবীর আর্য্যনন্দনগণের জ্ঞান-গর্ভ কর্ম্ম-কীর্ত্তি-কাহিনীর মণি-মরকতখচিত শতকোহিনুর শোভিত গৌরবময় মুকুট মস্তকে পরিয়া উন্নত ললাটের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন; তুমি সেই আর্য্য মনীষিগণের সাধন-সিদ্ধ কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণ করিলে বিস্মিত হইবে। যে শক্তির অস্তিত্ব প্রভাবে মানুষ—মানুষ, সেই শক্তি কর্ম্মবশে

আবরিত হইলে, মানব আপনাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করে। সাধনারূপ কর্ম্মবিশেষ দ্বারা ঐ শক্তির উদ্বোধন সাধিত হইলে, ঐশী শক্তিকে আকর্ষণ ও আয়ত্ত করিতে উহাই অত্যন্ত উপযুক্ত হয়। আমাদিগের পুরাণ ও ইতিহাস প্রণেতা আর্য্য মনীষিগণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির কর্ম্ম-প্রভাবজ স্বর্গীয় শুভময় ফলের বিবৃতি করিয়া উহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক শিক্ষার উৎকট প্রভাবে অনেকেই এখন ঐ সদুপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকাগুলিকে অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়া উপেক্ষা করতঃ নিশ্চেষ্টতার ঘনাবরণে আবৃত থাকিয়া বিদ্যাগৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে আনন্দ বোধ করেন।

যোগশাস্ত্রে যে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অসাধারণ শক্তি বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কবির ভাব কল্পনা-কাননের আকাশ কুসুম নহে; মানব জীবনের চেষ্টা যত্ন সাধিত কর্ম্ম-প্রভাবজ দেব-দুর্ল্লভ ঐশী শক্তির বিকাশ। আবার ঐ যে পুরাণ ইতিহাসে বর্ণিত দনুজ-দলিতা দীনা পৃথিবীর ভারাপহারী ভগবানের অবতারণার আখ্যায়িকাগুলি, উহাও কবির কল্পনা নহে; মানবের সাধন-সামর্থ্যের আশ্চর্য্য পরিচায়ক।

যোগ। ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়-শক্তি পরিচালনার ফলে ঐশী শক্তির অবতারণা যদি সম্ভব হয়, তবে যে ভারতে নিভৃত নিস্তব্ধ তিমির-গর্ভ হিমাদ্রি কন্দর হইতে সহস্র সহস্র পুণ্য-পূত তীর্থাশ্রম পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী সাধকের অবস্থান, সে

ভারতে কি তেমন একজনও কেহ নাই, যাঁহার পবিত্র শক্তির প্রভাব সুদীনা দেশ-জননীর দুর্ভাগ্য সন্তানগণের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে ?

দয়া। পরের জন্য কাঁদিতে আত্মবিস্মৃত জন, কোটী কোটী নরের মধ্যে ও বিরল বলিয়াই আজ ভারত অধঃপাতিত। নতুবা ভারতে কিসের অভাব ছিল। তবে—কেহ কেহ আছেন ব'ই কি, এবং তাঁহাদেরই পুণ্য প্রভাবে নিস্তব্ধ ভারতে ধর্ম্মালোচনার প্রবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে ; কিন্তু এই শ্রেণীর দেব-চরিত্র সাধকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, এবং তাঁহাদের শক্তি ও প্রয়োজনের হিসাবে পর্য্যাপ্ত বলিয়া অনুমান করা যায় না। জড়তা জড়িত পতিত ভারতকে উত্তোলন করিতে হইলে দেবোচিত শক্তির আবশ্যক। পর্ব্বত উত্তোলন করিতে মূষিকের শক্তিই যথেষ্ট নহে।

পুরাভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তদানীন্তন পরোপচিকীর্ষু মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ বিপদকালে উপায় নির্দ্দেশ করিতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তাঁহারা বিপদ কাল উপস্থিত হইলে চির-অপূর্ণ মানব-শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, দেশ-মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করতঃ অনাহারে, বাতাহারে, শীতাতপে কঠোর তপশ্চরণে সমাহিত হইয়া, সর্ব্ব-শক্তিমান শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্ম নিবেদন বিজ্ঞাপন করিতেন। বিপ্লুত দেশের শ্লথ-শক্তি সমাজ-বক্ষে স্বেচ্ছাচার-দৃপ্ত নরাকার প্রেত প্রেতিনীর ক্রীড়াভিনয়ে বিচূর্ণ-অস্থি নির্জীব প্রায় সরল প্রাণ সাধু-সজ্জনগণের আবাসভূমি শ্মশান

ক্ষেত্রে শব-সাধনার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে ঐশীশক্তিকে আকর্ষণ করিতেন। তাহারই ফলে সেই ভগবান,—যে ভগবান পর্ণকুটীরবাসী শীর্ণকায় জীর্ণ-চিরপরিহিত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ নন্দন বেদব্যাসের কঠোর সাধনার প্রবল প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া জরাসন্ধ্য, শাল্ব, দন্তবক্র, কংশ ও শিশুপাল প্রভৃতির প্রবল অত্যাচারে উৎসন্ন প্রায় দেশ-ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া বিরাট ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক ভারতে মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে ভগবান,—বিম্বিসারাদির প্রযত্ন প্রভাবে গৌতম বুদ্ধ "শাক্য" রূপে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের স্রোতে প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী পরিপ্লুত করিয়াছিলেন। যে ভগবান,—দেশ প্রাণ দয়ার্দ্র-চিত্ত শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য এবং সাধক ব্রহ্মহরিদাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রসূত সুকঠোর সাধন-শক্তির অত্যুগ্রপ্রভাবে, ঘনান্ধকার সমাচ্ছন্ন ভারত-বক্ষে শত সুধাকরের সুস্নিগ্ধ কৌমুদীরাশি ঢালিয়া মহিমাময় "শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব" আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং পুণ্য-পূত লোক-পাবনী ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃত প্রবাহে ভারত ভাসাইয়াছিলেন। বিপ্লববহ্নির লেলিহান জিহ্বার প্রবল প্রভাবে দেশ পুড়িয়া ক্ষার হইলেও, দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার কঠোর নিষ্পেষণে অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত বিচূর্ণ হইলেও, ঋষি প্রদর্শিত রক্ষণ নীতিশীল ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কলুষিত হৃদয়ের কালিমারাশী বিধৌত করিয়া সাধন-শক্তি উদ্বোধন করতঃ আমরা সেই ভক্ত বৎসল ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিতেছি ক'ই! তবে কেমন করিয়া, কি দিয়া আমাদিগের অভাব মোচন হইবে! কেন যোগজীবন, যে দুর্দ্দিনে ভগবৎ

শক্তি অবতারণ আবশ্যক হয়," এখনও কি ভারতের ভাগ্যে সে দুর্দ্দিনের বাকী আছে? না—আর বাকী নাই।

চাহিয়া দেখ,—শ্রীভগবানের লোকপাবনী লীলা নিকেতন, নন্দন-নিন্দিত সুখ-শান্তির আবাসভূমি সুর-নর-বাঞ্ছিত ভারত আজ স্বেচ্ছাচারের পদ পীড়নে নিতান্তই নির্জ্জিত। বিলাস-বিষ-দগ্ধ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পদভরে টল টলায়মান। বহুদিন ধরিয়া কর্ম্মহীন অলস জীবনের ভার বহিয়া বহিয়া, সলিল-বিপুলা শস্য-শ্যামলা কানন-কুন্তলা চির প্রসন্নময়ী প্রফুল্লাননা ভারত মাতা যেন আজ বিষাদ কালীমার প্রগাঢ় আবরণে চির আব-রিতা হইয়াছেন। যেন কাল প্রবাহের প্রবল প্রভাব মায়ের ধন-রত্ন সব ধুইয়া লইয়া, কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ শুষ্ক ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড ভারত-বক্ষে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। হতভাগিনীর আজ আর কিছুই নাই। সর্ব্ববিষয়িণী সুখ-সম্পদের অধীশ্বরী ভারত মাতার শান্তি, কান্তি, তুষ্টি. পুষ্টি, স্মৃতি, ধৃতি, আয়ু, আরোগ্য, বল ও বিদ্যা যেন আজ সব ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। আহা! শ্রীভগবানের চির-মাধুর্য্যময় মনোমুগ্ধকর নিত্য নব ভাবাভিনয়ের ক্রীড়া-ক্ষেত্র সেই ভারত যেন এই ভারত নহে। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী গৌরবশালিনী নিত্য নব ভাবানুপ্রাণিতা সেই ভারত মাতার কিছুমাত্র যেন এই ভারতে নাই। সেই দেব মন্দিরের অভ্রভেদী শিখরে গৌরবান্বিত ভারতের বৈজয়ন্ত পতাকা এখন আর উড্ডীন হয় না; তাহার পরিবর্ত্তে পাদপরাজ অশ্বত্থ, শাখা ও মূল সম্প্রসারণ দ্বারা আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিয়তি চক্রের ঘোর পরিবর্ত্তন বিজ্ঞাপন করিতেছে। অবিশ্রান্ত

আনন্দের আগার প্রাসাদ অভ্যন্তরে মুরজ-মন্দিরা-বীণার চির-রুচিকর সঙ্গীত ঝঙ্কারে এখন আর পথিকের প্রাণ নাচিয়া উঠে না, বরং তাহার বিনিময়ে সেখানে আজ অরণ্যচারী হিংস্র জন্তু-চয়ের শ্রবণ-বধির বিকট চীৎকার কালের প্রভাব প্রচার করিতেছে। ঐ দেখ, বহুদিবসাবধি অসংস্কৃত ভগ্ন-চূড় বিধ্বস্ত প্রায় শ্লথ-কলেবর মন্দিরাভ্যন্তরে পট্টশাটাবৃত দেব প্রতিমার পরিবর্ত্তে কৌপীন পরিহিত দীন প্রতিমূর্ত্তি ভারতের সুদীন দারিদ্র্যের বার্ত্তা বিঘোষণ করিতেছে। সেই নন্দন-নিভ কুসুম কাননের নিকুঞ্জ-নিথরে বাসন্তী ব্রততীর অন্তরাল, কোকিলের স্বর লহরীর পরিবর্ত্তে কণ্টকারণ্যের পেচক চীৎকারে পরিপূর্ণ। মলয়-অনিলান্দোলিত মধুকর শ্রেণী মুখরিত লতাবিতানের মনোমুগ্ধকর ক্ষেত্র আজ বংশদণ্ডে পরিবেষ্টিত। পল্লীস্থ দেব-মন্দিরে সান্ধ্য-আরতির কাঁসর ঝাঁঝরি ঘণ্টার শ্রবণ মধুর স্বর সংমিশ্রিত সিন্দুর শোভিনী সীমন্তিনিগণের সুবিমল আনন্দো-খিত জয়ধ্বনির পরিবর্ত্তে শিবাকুলের আকুল নিনাদ, সর্ব্বোপরি—ঐ কণ্টকাকীর্ণ বংশদণ্ড পরিবেষ্টিত জীর্ণ-কুটীরবাসী শীর্ণ কলেবর ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী হতভাগ্যগণের কঙ্কালসার নির্জীব প্রায় হতাশার প্রস্ফুট প্রতিচ্ছবিগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন, আসিন্ধু সুমেরু বিস্তৃত ভারত-বক্ষের মহাশ্মশানে অসংখ্য প্রেতাত্মা শূন্য মনে বিচরণ করিতেছে।

পারিবে কি যোগজীবন, পারিবে? ঐ মহাশ্মশানের কেন্দ্র স্থলে বসিয়া কঠোর শব-সাধনার বিদ্যুদ্বিকাশে দিগন্ত ঝলসিয়া দিতে পারিবে? সাধন-শক্তির মহাকর্ষণে সেই আর্ত্তজন বন্ধু

শরণাগতপালক দীনতারণ ভগবানের ঐশী শক্তি প্রকটিত করিতে পারিবে? পুণ্য-প্রস্রবণ করুণাসাগরের কৃপাবারি বর্ষণে এ মহাশ্মশানের বক্ষ বিস্তৃত জ্বলন্ত অনল শিখার লেলিহান জিহ্বা নির্ব্বাপণ করিতে পারিবে? পারিবে বৈ কি। আত্ম প্রত্যয়ের কঠোর শাসনে সন্দেহ প্রভৃতি রিপুগুলিকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও, সাধনার মহীয়সী শক্তিকে প্রবাহাকারে পরিচালন কর, জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই রহিবে না! ঐ দেখ, ভারতের চতুর্দ্দিকে তরলাকারে বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় যে ধর্ম্মালোকের পবিত্র জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতেছে, যদিও উহা বিচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণ বিরোধী ভাব সম্পন্ন বিপ্লব সূচক; তবুও— এক মহীয়ান শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে, উহা তদীয় চরণ তলে একীভূত হইয়া শান্ত-স্নিগ্ধ শত সুধাকরের সহস্রধারায় অমৃত বর্ষণের ন্যায় অজস্র পীযূষ-রাশী বর্ষণ করিয়া মৃতসঙ্কল্প ভারতবাসীকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। আবার—আবার ভারতের কুসুম উদ্যানে ফুল ফুটিবে, লতা-বিতানে কোকিল গাহিবে, দেব মন্দিরে সান্ধ্য-আরতি বাজিবে, প্রাসাদে মুরজ-মন্দিরা-বীণার আরাব স্রোতে পথিকের প্রাণ নাচিয়া উঠিবে। জড়ের ন্যায় নিদ্রা তন্দ্রায় কালাতিবাহন করিও না। গুরূপদিষ্টরূপে **"শক্তি-সঞ্চয়"** কর এবং নির্দ্দিষ্ট রূপ প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া পুরুষার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জীবনের সফলতা অনুভব কর। দয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যোগজীবনের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া এখন ও সেই পীযূষ-ধারা প্রস্রবিনী দৈবানুজ্ঞা সদৃশ আশ্বাস বাণী "পারিবে ব'ই কি" শব্দায়মান হইতেছিল। প্রগাঢ়-চিন্তা-নিবিষ্ট যোগজীবনের অন্তশ্চক্ষুর সমুজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিতে পাইল, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমা-নিশার স্তূপীকৃত তমসাবরণে আবরিত ভবিষ্যৎ গগনের যবনিকার অন্তরালে জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমাজ।

যদি জাগে তবে কেন বা ঘুমায়। *
কেন বা আলোক আঁধারে মিশায়।
কেন কুহকিনী আশা আলো করে
কেন বা উজলে তমিস্র আঁধারে,
কেন বা লুকায় কোথা চ'লে যায়;
তৃণ হেন কাল-স্রোতে ফেলে হায়॥

প্রকৃতির রাজ্যে জড়েও কেমন,
কঠোর সাধনা করে গো সাধন,
কেন বল নর অলস অসার,
জীবন সমরে হীন হেন রয়॥

কে জানে প্রকৃতি কি খেলা তোমার,
তুমি বা কেমন তোমার ভাণ্ডার,
ধৈর্য্য, সহ্য, ত্যাগ জীবন-অলঙ্কার,
দিয়াছ জড়েরে নরে কিন্তু নয়॥

ভৈরবী—একতালা।

জ্ঞান গরিমায় মানব নিচয়
সৃষ্টি রাজ্যে শ্রেষ্ঠ এই মনে হয়,
সাধনায় কিন্তু জড়ের হয় জয়,
এ রীতি প্রকৃতি বুঝা বড় দায় ॥

কলনাদিনী সুরধুনীর বীচিমালা বিধৌত সোপানাসনে সমাসীন দয়ানন্দ ভাব-বিহ্বলচিত্তে গানটী শেষ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তরঙ্গাভিঘাত বুকে ধরিয়া এ সোপানাবলী মানব জগৎকে শিক্ষা দিতেছে যে, সহিষ্ণুতায় জড় জগৎ মানবকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। মানব অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, অবশেষে স্রোতে ভাসিতে থাকে। মানব বুঝে না যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধিকর উন্নতি লাভের জন্য অনন্তকাল ধরিয়া অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাও বিধেয়। অসহিষ্ণু জীবন উচ্ছৃঙ্খলতার আবাসভূমি। তাই বুঝি সহনশীল জড় জগৎ আবহমান কাল হইতে জাগতিক সুশৃঙ্খলা পূর্ণ সুদর্শন নীতির সত্ত্বা সংরক্ষণ করতঃ আপনাকে ক্রম বিকাশক মহাশক্তির মধ্য দিয়া অনন্ত—অসীম উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী করিতেছে। এ সোপানশ্রেণী যেমন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অচল অটল সহ্যাদ্রির ন্যায় বুক পাতিয়া তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণ করিতেছে, এবং দিবস শর্ব্বরী সহস্র সহস্র পদপীড়নেও উৎপীড়িত না হইয়া নীরবে আপন কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষবল্লরী যেমন অত্যুগ্র শীতাতপ বরষার বারিধারা শিরে ধরিয়া আজীবন আপন মনে আপন ধ্যানে নীরবে কালাতিবাহন করিতেছে, মানুষ তেমন পারে না। কেন

পারে না? কিসের অভাবে মানব জড় অপেক্ষা হীন, তাহা কে বলিবে! শক্তি সমষ্টির আবাসভূমি মানব, ইচ্ছা করিলে কাল প্রবাহের পরিবর্ত্তন করিতেও সমর্থ হইতে পারে বলিয়াই মানবকে সৃষ্টির চরম উন্নতি বলা হয়। কিন্তু কি জন্য—কি দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত মানব দেব-দুর্ল্লভ নর জন্মকে অলসতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আধার করিয়া তুলে তাহা কে বলিবে! আবার ইহাই বা কে বলিবে যে, ঊষার আলোকে বালকের উদ্যমশীলতার ন্যায় কিসের আলোক দেখিয়া মানব আপনার ভবিষ্যৎ গগনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দুই একপদ দৌড়াইয়াই আপনাকে ঘোর অবসাদে ঢাকিয়া ফেলে। এই নিস্তেজতার মূল তথ্য কি, তাহা অনুসন্ধান করাও এক দুরূহ ব্যাপার।

ইতি মধ্যে যোগজীবন উপস্থিত হইয়া দয়ানন্দের চিন্তা প্রবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কহিলেন প্রভো? আমার জন্য আপনাকে অনেক বিরক্তি ভোগ করিতে হইবে।

দয়া। কেন?

যোগ। আপনার গভীর গবেষণাপূর্ণ নানাভাবদ্যোতক আলোচনাগুলি আমার ন্যায় হীনমস্তিষ্ক মানুষের অবধারণা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। তবুও উহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। তাহার জন্য আপনাকে বিরক্ত করা ব্যতীত অন্য কি উপায় আছে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ভারত উন্নতির উচ্চ সোপান হইতে অধঃপতিত হইল কেন। যে শক্তি প্রভাবে ভারত এই প্রকার নীচগামী হইয়াছে,

কি উপায়ে সেই শক্তি উৎসাদন করিয়া পুনরায় ভারতে পবিত্র শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

দয়া। বিরক্তি কিছুই নহে, তুমি সহিষ্ণুতা সহকারে শুনিতেছ, আজকালকার দিনে ইহাই যথেষ্ঠ।

শুন,—ভারত কেন অধঃপাতিত। জাতীয়-শিক্ষা, ধর্ম্মভাব এবং কর্ম্ম পদ্ধতি বিস্মৃত স্বেচ্ছাচারীগণের উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজ-শক্তি শিথিল হইয়া সমাজস্থ নরনারীগণের জাতীয়-জীবন রক্ষণশীল কর্ম্ম-শক্তি ধ্বংস হইতেছে; তাই ভারত অধঃ-পাতিত।

সমস্ত দেশের সমাজের সমুদয় লোকগুলি সাধারণতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা আমাদের দেশের এবং আর্য্যজাতির ভাষায় উহাকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। যাঁহারা উত্তম বা সাত্ত্বিক শ্রেণীর লোক, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান। সমাজ তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আশা করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কাল হইতে, সাত্ত্বিক প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই সন্ন্যাস ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে বর্ত্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরাও বিরাগ বুদ্ধির প্রবলতা হেতু সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন। ইহারা সমাজের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়াও প্রায়শই সমাজের হিতাহিত চিন্তায় উদাসীন। কেহ কেহ দূরে দাঁড়াইয়া "জ্ঞানার্জ্জন কর" "ধর্ম্মার্জ্জন কর" এই প্রকার অনুমতি করিয়া আপন কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছেন। ফল কথা এখন আর

আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা ঋষিগণ কথিত আশ্রম ধর্ম্মের বিধানানুযায়ী চতুর্থ আশ্রমোক্ত সন্ন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, সমাজ আধুনিক সন্ন্যাসিগণের নিকট হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। এই প্রকার অবস্থায় সন্ন্যাসী শ্রেণীস্থ সাত্বিক প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের উপর সামাজিক সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির ভার চাপাইয়া লাভ নাই। তবে,—বর্ত্তমানে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত হরিদ্বারের গুরুকুল আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণ আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। দেখা যাউক তাঁহারাই বা দেশের জন্য—সমাজের জন্য কতটুকু কি করেন। অপর দিকে তামসিক বা নিম্ন শ্রেণীর লোক-গুলির নিকটে সমাজ, লোক হিতকর গবেষণাপূর্ণ কোন অনুষ্ঠানের আকাঙ্খা করিতে পারেনা। কারণ তাহারা নিজেরাই অন্ধ, অন্যকে পথ দেখাইবে কি প্রকারে। এই রূপে এই দুই শ্রেণীর লোক গুলিকে বাদ দিলে, সমাজের হিতাহিতের দায়িত্ব অনেকাংশে রাজসিক বা মধ্যম শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল এবং কর্ম্মপটু, অথচ সংসার ও সমাজের সহিত বিশেষভাবে জড়িত, তাঁহাদিগকেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সমাজের হিতাহিতের জন্য এই শ্রেণীর লোকেরাই সম্পূর্ণ দায়ী। ইহারা যদি আর্য্য সমাজের পুরাতত্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা নিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনাদিগের

কর্ম্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইতেন, তবে বোধ হয় দেশের অবস্থা এত হীন হইতে পারিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ "গুণ হ'য়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।" আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য পুরা ভারতের গৌরবময় আদর্শ চিত্র গুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া ভারতীয় আর্য্য সমাজকে প্রকৃতই অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতেছে। আধুনিক ভারত পুরা ভারতের কপিল, কণাদ, ব্যাস, বাল্মীকির পবিত্র সিংহাসনে পাশ্চাত্য মনস্বী Hegel, Spencer, Shelly, Browning, Byron কে বসাইতে চেষ্টা করিয়াই ঘোর অধঃপতনের পথে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। পুরা ভারতের মহা মনস্বী আর্য্যঋষিগণের অমৃতধারা প্রস্রবিনী ধর্ম্মালোচনা উপেক্ষা করিয়া; যে মহাশক্তির প্রবল প্রভাবে পুরা ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভারতের উন্নতি প্রয়াসী আধুনিক বিজ্ঞ প্রবরেরা ভারতবাসী জন সাধারণের হৃদয় হইতে সেই শক্তি উন্মূলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গ প্রভাবে পূর্ব্বপুরুষগণের শিক্ষা দীক্ষা এবং কর্ম্ম পদ্ধতি পরিহার পূর্ব্বক বিলাসের বিলোল কটাক্ষে বিমুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্তি বাসনায় প্রতপ্ত লৌহ গোলককে আলিঙ্গন করিতেছেন। নিষ্প্রয়োজন বিলাসিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অলসতা, নির্বীর্য্যতা, কর্ম্মহীনতায় ভারত আজ সমাচ্ছন্ন। ইহাই ভারতের যাবতীয় অধঃপতনের মূল কারণ। দীর্ঘকাল অবধি ক্রমে ক্রমে এই বিষস্রোত ভারতের অস্থি মজ্জায় এমন ভাবে

সঞ্চারিত হইয়াছে যে, ইহার প্রতীকার করা এক তুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যোগ। পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা ভারতবাসী অধিক বিলাসী নহে, কিন্তু ক'ই পাশ্চাত্য জাতি'ত ভারতবাসীর ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যহীন অলসতার আধার নহে।

দয়া। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মলয়জ শীতলা ভারত ভূমির ন্যায় পাশ্চাত্য ভূমি অনায়াস লভ্য জীবিকা প্রসবিনী নহে। তথাকার অধিবাসীদিগকে জীবিকার্জ্জন করিয়া আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতির সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়। এই জন্য পাশ্চাত্য জীবন বাল্যকাল হইতে আপন আপন সংসার ও সমাজের নিকট হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার ফলে তাহাদিগের দেশ ও জাতীয় জীবনোপযোগী কর্ম্ম-শক্তিকে এত অধিক পরিমাণে জাগরূক করিতে পারে যে, তাহার তুলনায় তাহাদিগের বিলাসিতা অতি সামান্য। তাই তাহাদিগের বিলাসিতা অধিক অনিষ্টকর হইতে পারে না।

যোগ। যে উপায়ে তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে উপায়ে আমাদিগের শিক্ষা লাভ করিবার বাধা কি?

দয়া। বাধা নাই, অভাব আছে। কালচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গীয় আর্য্য সমাজে জাতীয় উন্নতিকর গুণের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। বল, তবে আর কোথায় শিখিবে? যখন ভারতীয় আর্য্য সমাজ আর্য্যজনোচিত গুণ গ্রামে বিভূষিত ছিল, তখন ভারতমাতা পৃথিবীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবশালিনী ছিলেন। তখন ভারতের কথা পৃথিবীর সমস্ত দেশে আলোচনা হইত।

যোগ। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যত্নে এবং দেশীয় ধনবান দিগের চেষ্টায় দেশে এত স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এত শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে কি কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না?

দয়া। উপকার হইতেছে না তাহা বলিতেছি না। তবে— যাহা আমাদিগের প্রকৃত আবশ্যক তাহা পাইতেছি না। কারণ আধুনিক শিক্ষা এত অল্প পরিমাণে এবং এমন একটা স্বতন্ত্র দিক দিয়া হইতেছে যে, তাহাতে ভারতবাসীর প্রকৃত উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না। সাধারণতঃ কয়েকটী কথা চিন্তা করিলেই উহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ চিন্তা করিয়া দেখ, য়ুরোপের অধিকাংশ স্থলে সংখ্যানুসারে স্কুল কলেজাদি যে প্রকার বহুল প্রতিষ্ঠিত, ভারতের জন সংখ্যানু-সারে শিক্ষাগারের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম।

দ্বিতীয়।—পাশ্চাত্য দেশে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তন থাকায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে সুযোগ পায়। ভারতে সে সুযোগ নাই।

তৃতীয়।—ভারতের সভ্য সম্প্রদায় অন্ততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ প্রকারে অনুভব করিতে পারিলেও, অর্থাভাব প্রযুক্ত অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত থাকেন।

চতুর্থ।—পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাগে ভারতবাসী ইংরাজী ভাষা মাত্র শিক্ষা করিয়া দাস-সুলভ হেয় জীবনের রসাস্বাদন করিতে

পটু হইতেছে মাত্র। দেশোন্নতিকর শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার জন্য ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয়, প্রত্যুত পাশ্চাত্য দেশে গমন প্রচুর ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে যাইতে পারেন না।

পঞ্চম।—ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর শিক্ষাগারে ধর্ম্ম শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই।

এ সব কথা যাহাই হউক, ভারতবর্ষ যে অনেক আদিম ও সভ্য জাতির আবাস স্থল তাহাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত কাল ধরিয়া ভারতে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও এত অল্প সম্প্রসারণ হইতেছে যে, নব প্রবুদ্ধ জাপানীর সহিত তুলনা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। অনতিদীর্ঘ কালের চেষ্টায় জাপানবাসীরা শতকরা প্রায় আশী জন শিক্ষিত হইতেছে, কিন্তু ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সংখ্যা দশ জনের অধিক হইবে না। এইরূপ সল্প-সম্প্রসারিত শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসী যে সুদীর্ঘকালে পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত অভিধা প্রাপ্ত হইয়া দেশের উন্নতি সাধন করিবে, সে সুদীর্ঘকাল অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে ভারতবাসীর অস্থিমজ্জা বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

এখন একবার সমাজের কথা চিন্তা করিয়া দেখ। সমাজই মানবের প্রকৃত শিক্ষাগার। কারণ কর্ম্ম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পদ্ধতিগুলি সমাজ-বক্ষ হইতে শিক্ষা করিতে হয়। ইহা স্বভাবের সনাতন নীতি যে, বালক বালিকা তাহাদিগের পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা এবং প্রতিবেশিগণকে যেমন করিতে

চলিতে, বলিতে দেখে, তেমনই শিখে। সুতরাং সমাজ-ক্ষেত্র পবিত্র ভাব প্রণোদিত না হইলে, বালক বালিকাগণের শিক্ষা-সুলভ শক্তির বীজ অনুশীলিত না হইয়া বিশুষ্ক হইয়া যায়। কালে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রয়োজনের চাপে পড়িয়া এবং চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া যখন তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন উন্নতিজনক শক্তিকে উত্তেজিত করিতে যে প্রয়াস পাইতে হয়, তাহাতে প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়। তখন মৃত্যু-চিন্তা-কাতর বার্দ্ধক্যের জরা জীর্ণ দেহযষ্টি হতাশার প্রস্ফুট প্রতিচ্ছবিরূপে মানব নয়নের গোচরীভূত থাকে মাত্র। তাহার চিন্তা-শক্তি থাকিলেও কর্ম্ম-শক্তি থাকে না। হীন শক্তি সমাজে এই প্রকারে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী নর পৃথিবীর ভার বর্দ্ধন করিয়া সমাজের শক্তি হরণ করতঃ কালে আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ভারতীয় সমাজে বর্ত্তমানে সেই প্রকার দুর্দ্দিনের আবির্ভাব হইয়াছে।

স্থূলত যাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি এক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হয়, সেই মানব সমষ্টি লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত হয়। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মের মধ্যে জাতিগত ধর্ম্মভাব প্রস্ফুট করাই সমস্ত সমাজের মানবের বিশেষ লক্ষ্য। প্রত্যেক সমাজ বা জাতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি স্থূল ব্যাপার এমন ভাবে মীমাংসিত ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, সেই গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম-জীবন পরিচালিত করিতে পারিলেই সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সদ্ভাব হইয়া উঠে; এবং যতই সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে,

ততই কর্ম্ম-জীবন গুলি সমধিক উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক সমাজের কর্ম্ম-পদ্ধতি অন্য সমাজের উন্নতির জনক হইতে পারে না। যাহা হউক এই প্রকারে মানব সমূহের কর্ম্মগত উন্নতিতে সমাজ এবং সমাজের উন্নতিতে মানবগণের উন্নতি ওতঃপ্রোত ভাবে সাধিত হয়।

সমাজ-ক্ষেত্রই কর্ম্ম জীবনের শক্তির জনয়িত্রী। সমাজস্থ মনস্বী ও শক্তিশালিগণ স্বোপার্জ্জিত উন্নত জ্ঞান ও সুনীতি প্রবাহ পরিচালন দ্বারা সমাজকে সমধিক শক্তিশালী করেন, এবং সমাজস্থ বালক বালিকাগণ ঐ সমাজ-বক্ষ হইতে শিক্ষা-দ্বারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সমধিক বলীয়ান করিয়া তুলে। এই প্রকারেই সমাজের উন্নতি দ্বারা দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। সুতরাং যখন যে সমাজে মনস্বী-শক্তিশালী, কর্ম্ম-প্রিয়, দেশ ও সমাজ হিতাকাঙ্খিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমাজ সমধিক শক্তিশালী এবং সেই দেশ সমধিক উন্নত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংসর্গ প্রভাবে, আর্য্য জাতির পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন পাশ্চাত্য ভাব, আর্য্য সমাজের আধুনিক শিক্ষিতগণ হইতে মধ্য শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতগণের মধ্যে অল্লাধিক বিস্তার লাভ করিয়া, তাহাদিগকে পুরাপ্রিয় বৃদ্ধগণ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতেছে; এবং ইহারই ফলে আজকাল আবার জাতিতে জাতিতে উন্নতি জ্ঞাপক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র সমাজে এক ঘোরতর আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করিতেছে। এই প্রকার বিপ্লব সূচিত

সমাজে কর্ম্ম-শক্তির অভাব হওয়া স্বাভাবিক; এবং ইহাও সত্য যে, কর্ম্ম-শক্তির অভাব হইলে সমাজ বা দেশ দ্রুত অধঃপতনের পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে।

এক একটী করিয়া বহু মানবের সমষ্টি লইয়া একটী সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং সমাজ মানব সঙ্ঘের একটী বিরাট শরীর; অথবা সমাজরূপ বিরাট শরীরের এক একটী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ এক একটী মানব। কোন দেহের একটী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কর্ম্মহীন হইলে দেহের সেই অংশটী শক্তিহীন হইয়া যায়। যদি কোন দেহের দুই চারিটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ম্মহীন হয়, তবে সেই দেহটি যেমন মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সেই প্রকার সমাজরূপ বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ মানবগুলি যদি সমাজোচিত কর্ম্মহীন হয়, তবে সেই সমাজ ও মৃতকল্প হইয়া পড়ে। একটী রুগ্ন দেহীর কেশ প্রভৃতি যেমন অকালে সৌন্দর্য্য হারা বা লুপ্ত হয়, সেইরূপ হীনশক্তি রুগ্ন সমাজে নব জাত বালক বালিকাগণের মধ্যে মানবোচিত গুণ রূপ সৌন্দর্য্যরাশি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা জন্মাবধি পরের মুখ চাহিয়া ভিক্ষা-লব্ধ আহার্য্যে উদর পূরণ করতঃ নির্জ্জীবভাবে দুই চারি দিন জীবিত থাকে, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বদা চিন্তা করে যে,—

"চাওয়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে
অনাহারে ম'রে যাওয়া ভাল তার চেয়ে।"

ক্রমে অনুতপ্ত চিন্তাক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহ অকালে কালের উদরে উপঢৌকন দিয়া দুর্ব্বল দেহে গুরুভার বহনের দায় হইতে

অব্যাহতি লাভ করে। এই প্রকারে তাহাদের সমাজ ও ধ্বংস-মুখে অগ্রবর্ত্তী হয়।

দেশই এক দিকাভিমুখী বুদ্ধি বিশিষ্ট নর সমষ্টি বা সমাজের সম্মিলিত শক্তির বিকাশ ভূমি, অর্থাৎ কর্ম্মস্রোত পরিচালনের ক্ষেত্র। কৃষক যদি শক্তিহীন ও কর্ম্মহীন হয়, তবে তাহার ক্ষেত্রে যে প্রকার উর্ব্বরতারূপ সৌন্দর্য্যের অভাব ঘটে, সেইরূপ দেশবাসিগণের জাতীয় ভাবহীন জীবনের আলস্য ও অযত্নের ফলে দেশে উন্নতিজনক শক্তির অভাব হইয়া দেশ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে। দেশ বাসিগণের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্য, পৌর্ত্ত, স্থাপত্য প্রভৃতি আর্থিক এবং সন্ধ্যা, বন্দনা, জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্ম্ম-শক্তির অপলাপ হইয়া সামান্য মাত্র কৃষি শক্তির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাই কৃষককুলের অনুকম্পায় তোমাদের শ্রীহীন সত্ত্বা মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। কালে ইহাও থাকিবে-না। অন্ধকার হইতে অন্ধকার—ঘন-ঘটা সংমিশ্রিত অমানিশার নিবিড়তর তমসাবরণে প্রাচ্য সমাজ ঢাকিয়া যাইবে। আধুনিক সভ্যতার কুহেলিকায় উদ্ভ্রান্ত তোমরা পাশ্চাত্য আলোকে প্রাচ্যকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইবে না।

যোগ। আপনি কি বলিতে চাহেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম এই প্রকার, সুতরাং উহা ত্যাগ করা হউক।

দয়া। না, আমি তাহা বলিতে চাহি না। পাশ্চাত্যভাষা রাজ ভাষা। উহা ত্যাগ করিলে রাজায় প্রজায় সংস্রব থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষায় কোন দোষ

হয় না; পাশ্চাত্য ভাবটাই আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য আদর্শই প্রাচ্য সমাজকে কলুষিত ও বিধ্বস্ত করিতেছে।

যোগ। পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট আমাদের শিখিবার মত কিছুই নাই কি?

দয়া। কিছু আছে ব'ই কি। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন দেশ-বাসীর নিকট হইতে নানাপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া তাহার সারভাগ বাছিয়া লইয়া, কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে অপনাদিগের জাতীয় ভাবের পুষ্টতা সাধন করাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নহে যে, যে দেশের প্রত্যেক জীবনটী কর্ম্ম প্রিয়তা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, সৎসাহসিকতা, অদম্য আশা ও উদ্যমশীলতা, আত্ম-নির্ভরশীলতা তেজস্বিতা, স্বজাতি বৎসলতা জাতীয়ধর্ম্ম, জাতীয়শক্তি, জাতীয় গৌরব, সম্প্রসারণে সচেষ্টতা প্রভৃতি গুণাবলীতে বিভূষিত; শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতি কর্ম্মে-দক্ষহস্ত, আমরা সুদীর্ঘকাল সেই জাতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সেই জাতির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, তেমন করিয়া গড়িতে পারিতেছি ক'ই? আমরা যদি তাহাদের নিকট হইতে ভাল ভাবগুলি যাহা কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে আমাদিগের সমাজের উপযোগী, তাহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া. অনুশীলিত বুদ্ধি বৃত্তি ও উদ্বোধিত কর্ম্ম-শক্তি দ্বারা স্বীয় সমাজকে সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতাম, তবে বোধ হয় সমাজ-ক্ষেত্র অন্য আকার ধারণ করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা।

(আজ কেন) তোর স্বর শুনে
প্রাণে লাগে ব্যথা।
কে তোরে শিখাল কেমনে শিখিলি
কোথা পেলি বল এ নূতন কথা।

বিজন বিপিন মুখরিত করি
ঢালিতে বিহগ যে স্বর লহরী
(সেই) মধুমাখা গীতি সহসা বিসরি
কেনরে গাহিলি এ কর্কশা গাথা ॥

একদিন পাখী নিকুঞ্জে বসিয়া
উদাত্তানুদত্ত স্বরিত মিলাইয়া
গান্ধার মধ্যম ধৈবত সাধিয়া
গাহিলি গৌরীতে পূর্ব্ব গর্ব্ব গাথা ॥

নিস্তব্ধ জগতে ঢালিলি কি ধ্বনি
সেই ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বাণী
বিস্ময়ে এ বিশ্ব চাহিল অমনি
হরষে শুনিল কি নূতন কথা।

আর এক দিন বসি চিত্রকূটে
অপূর্ব্ব সঙ্গীত গেয়ে ছিলি বটে
বীণার ঝঙ্কারে নব কাব্যে ফুটে
শুনালি পাখীরে রামায়ণি কথা।

আর এক দিন হিরণ্বতি তীরে
গেয়েছিলি গীতা মধু মাখা স্বরে
শুনেছিল সবে মন প্রাণ ভ'রে
ভুলেছিল দেশ সুখ দুঃখ কথা।

কি গাহিছ আজ শুনা নাহি যায়
গাহিও না পাখী সাধিগো তোমায়
পূরব গরব পূরবী ভাষায়
পার যদি গাও মিনতি সর্ব্বথা।*

সোপানোপবিষ্ট দয়ানন্দ গঙ্গাতীরস্থ বৃক্ষ-বল্লরীর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া গানটী গাহিতেছিলেন। ক্রমে গানটী শেষ হইতে হইতে যোগজীবন আসিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পূর্ব্বানুবৃত্তির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* গৌরী—একতালা।

যোগজীবন কহিলেন প্রভো! আপনি বলিয়াছিলেন সমাজস্থ নরনারিগণ কর্ম্মহীন বলিয়া সমাজ ও দেশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই মানুষ কর্ম্মহীন নহে; হস্তপদাদি দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া, অগত্যা চিন্তারূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া দ্বারা কালাতিপাত করিতেছে। শুনিয়াছি কর্ম্ম না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। কর্ম্ম ফুরাইয়া গেলে মানব ধরাধাম পরিত্যাগ করে। তাই বোধ হয় স্বভাব-শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানব সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতেছে। গীতায় পড়িয়াছি, শ্রীভগবান কহিয়াছেন ;—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃকর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ।"

গীতা ৩ঃ অঃ

কেহই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-প্রভাব সত্ত্ব, রজঃ, তম প্রভৃতি গুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবশভাবে (অজ্ঞভাবে) কর্ম্ম করে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্বভাবের প্রভাব অনাদিকাল হইতে অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইতেছে। সূর্য্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদয় হইতেছে, অথবা থিবী স্বভাববশে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণাবর্ত্তে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্র সুধাধারা ঢালিতেছে. সাগর সলিল স্ফীত--উদ্বেলিত

বা শুষ্ক হইতেছে। সুতরাং মানব ও স্বভাব বশে জন্মিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে এবং কর্ম্ম ফুরাইলে মরিয়া যাইতেছে। ইহা স্বভাবের অক্ষুণ্ণ প্রভাব। অবশ্য শিল্প, বণিজ্য, স্থাপত্য, সন্ধ্যা বন্দনা, জপ, যজ্ঞাদির আপেক্ষিক অভাব হইয়াছে; তাই বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে কর্ম্মহীন হইয়া সমাজ ও সমাজস্থ নরনারিগণ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে।

দয়া। তুমি সত্যই বলিয়াছ, কর্ম্মহীন নর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্ম আছে সত্য কিন্তু তাহার ছাঁচ উল্টাইয়া গিয়াছে, তাই এত গোলযোগ। যোগজীবন! আর্য্য শাস্ত্র সমূহের মধ্যে বর্ত্তমানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে গীতা শাস্ত্রের যে প্রকার বহুল প্রচার দেখিতে পাই, তাহাতে আশা ও আনন্দ হয় যে সেই পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের করুণা-কণায় ভারত বঞ্চিত হয় নাই। ভারতের ঘুম ভাঙ্গিতেছে এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। আবার ভারতে হাসিররোল উঠিবে, আনন্দের ধারা ছুটীবে, আবার ভারত মাতার বিশুষ্ক মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইবে। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের কৃপায় আমার আশা ফলবতী হউক, কিন্তু এদেশে শাস্ত্র আছে শিক্ষা নাই; সুতরাং বহুল প্রচার হইলেও শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উপেক্ষিত হইতেছে মাত্র।

যোগজীবন! একটা কথা চিন্তা করিয়া দেখ যে, পাশ্চাত্য দেশবাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা এ দেশে অনেক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তথায় প্রতিদিন সমস্ত শিক্ষার্থীকে কিছু সময়ের জন্য ধর্ম্ম পুস্তক (বাইবেল) শুনান হয়। আর আমাদের দেশ-বাসী মহাত্মাগণ যে সমস্ত শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,

তাহার কোথায়ও কি সে প্রকার ব্যবস্থা আছে? কেন নাই বল দেখি? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের কর্ম্মের ছাঁচ উল্টাইয়া গিয়াছে তাই আমরা উল্টা বুঝিতেছি। শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিতেছি, শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কিন্তু সেথায় প্রাচ্য শিক্ষার অর্থাৎ আর্য্যজাতির জীবন সর্ব্বস্ব ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। আছে—Politics, Economy, Science Chemistry প্রভৃতির খোসা অর্থাৎ বহিরাবরণ। উহার ও প্রকৃত রহস্য এ দেশে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদিও কোথায় শিক্ষকেরা এক আধটুকু ধর্ম্মালোচনার চেষ্টা করেন, কিন্তু অনভ্যস্ত শিক্ষার্থীরা তাহাতে মনোযোগ করে না; ইহা কি সাতিশয় দুঃখের বিষয় নহে। বল,—এ দেশে গীতার বহুল প্রচার হইয়া কি ফল হইবে? বালকেরা ঔৎসুক্য প্রযুক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে পারে এবং না হয় পড়িতেও পারে, কিন্তু বুঝিবে কেন? উপ-নিষদের সার মর্ম্ম গভীর রহস্যোদ্দীপক গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধারণে প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিতে পারে না, বরং বিপরীত বুঝিয়া থাকে। তাহারই ফলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, অজ্ঞেরা দুই পাতা গীতা পড়িয়াই বেদান্তের দোহাই দিয়া অথবা সেই প্রকার অন্য একটা কিছু বলিয়া, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম পদ্ধতির দ্বারা আত্মোন্নতি সাধক এবং জাতীয়-জীবন গঠনোপযোগী শিক্ষামৃতপূর্ণ পুরাণ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পর ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" *

গীতা তৃঃ অঃ

গীতার এই শিক্ষামৃত কতজন পান করিয়াছে? কতজনে গীতার সেই দেব-দুর্লভ উপদেশ দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদান্ধতারহিত স্বার্থশূন্য পরার্থবান, কর্ম্মকুশল জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে? কতজনে নিত্যকর্ম্ম আহার বিহার ও নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনা, জপ যজ্ঞাদিতে যম, নিয়ম অভ্যাসে যত্নবান হইয়াছে তাহা বল দেখি? কিছুই নহে।

অলঙ্কার নির্ম্মাণের ছাঁচ থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুসমূহ গলাইয়া সেই ছাঁচে ঢালিয়া কুণ্ডল বলয়াদি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা যায়। দেখা যায় যে একই স্বর্ণ এক ছাঁচে ঢালিয়া বলয়াকারে পরিণত হইয়াছে, আবার সেই স্বর্ণ অন্য ছাঁচে পড়িয়া কুণ্ডলাকারে পরিণত হইতেছে। ছাঁচের পরিবর্ত্তনে ধাতুর আকার পরিবর্ত্তিত হয়। মানবের অন্তঃকরণ গলিত ধাতুর ন্যায়, অত্যন্ত তরল, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে। পুরাকালে আর্য্যজাতির মনোবৃত্তিকে যে প্রকার শিক্ষার ছাঁচে ঢালিয়া যে আকারে গঠন করা হইত, আজ ভারতের কোন শিক্ষাগারেই সে প্রকার শিক্ষার ছাঁচ দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিনব

---

* সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত পর ধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়ঃ। কেননা স্বধর্ম্মে নিধনেও স্বর্গ সাধন হয় এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এ জন্য নরক জনক হয়।

ছাঁচের আবির্ভাব হইয়াছে এবং অল্পবয়স্ক কোমলমতি শিক্ষার্থি-গণের মনোবৃত্তিকে সেই পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া পাশ্চাত্যভাবে গঠন করা হইতেছে।

বংশপরম্পরানুসারে যে প্রকার ভাবমিশ্রিত রক্তকণিকায় তাহাদিগের জন্ম, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের মনোবৃত্তি যে প্রকার হওয়া উচিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাহাদিগকে তদ্বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছে। অধিকন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের আলোচনায় বাধ্য করিয়া বলপূর্ব্বক তাহা-দিগের মস্তিষ্ক শক্তিকে নিষ্পেষণ করা হইতেছে। ফলে শতকরা ৫০জন রাশীকৃত অধীত পুস্তকের মধ্য হইতে তোতাপাখীর ন্যায় কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া, পরীক্ষার ফলস্বরূপ একখানি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতঃ দাস-সুলভ হীন জীবনের অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হইয়া বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকে। তাই বলি, ভারতে এখন গীতার—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"

বুঝাইবার জায়গা নাই,— বুঝিবার লোক নাই। তাই গীতার বহুল প্রচারেও ফল হইতেছে না।

সে যাহা হউক, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ধীরভাবে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভারতীয় শিক্ষাগারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্মিলনে প্রাচ্য জাতির প্রাচ্য দর্শন ও ধর্ম্মনীতির বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন না করিলে, ভারতীয় আর্য্য-জাতির জাতীয়-জীবন যে বিপরীত গতিতে পরিচালিত

হইতেছে, তাহার ফলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইবে।

ভারতের পুরাতন শিক্ষানীতি সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত। আধুনিক ভারতে সংস্কৃত ভাষা আলোচনার অত্যন্ত অভাব হওয়ায়, ভারতবাসী আর্য্যজাতির রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা নির্ম্মাণকারী উপাদানস্বরূপ ধর্ম্মনীতি অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্যসমাজের মূলভিত্তি ধর্ম্মনীতি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি মনস্বী ঋষিগণের গভীর গবেষণা সম্ভূত যে সুনীতি সমষ্টির উপর দণ্ডায়মান বলিয়া, কালচক্রের কঠোরতর আঘাতেও অদ্যাপি আর্য্যসমাজ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে; আজ ভারতের কোনও শিক্ষাগারে সে নীতির আলোচনা নাই। পূর্ব্বের চতুষ্পাঠীগুলি সর্ব্বদা সংস্কৃত শাস্ত্র এবং তথা কথিত ধর্ম্ম-কর্ম্মনীতির আলোচনা করিত। ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ত্তমানে সে গুলির অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, বালকগণ স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, ধর্ম্মবিশ্বাস বিরহিত তর্কপটু হইয়াছে; সমাজে সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র নাই, সকলেই স্বতন্ত্রতাবলম্বনে বিশেষ চেষ্টিত। দেশবাসী দেশবাসীর নিকট কিংবা প্রতিবেশী প্রতিবেশীর নিকট প্রতি পদবিক্ষেপে সাহায্য আবশ্যক বোধ করে। যে সমাজে তাহার অভাব হয় বল, সে সমাজের পরিণাম কি ভয়ানক। তবে—কখন কখন বালকদিগের মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্থায়ী হুজুগপ্রিয়তা মাত্র। যদি

দেশের অবস্থা বুঝিতে চাহ, তবে সহরের দিকে তাকাইও না; কারণ সহরের ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন, বহিরাবরণ চির-কালই সুন্দর রহিবে। ঐটী পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। জাতীয়-জীবনের জনন-ক্ষেত্র পল্লীচিত্রে নয়ন নিক্ষেপ কর, দেখিবে—তথায় বাহিরে জঙ্গল, ভিতরে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কলুষিত চিন্তায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে।

যোগ। জাতীয়তা লইয়া ভারতে এত বড় তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল, উহাতে জাতীয়-জীবন গঠনের কিছুমাত্র সাহায্য হয় নাই?

দয়া। বিশেষ কিছু নহে। কারণ, ভারতের জল বায়ু, পর্ব্বত-কন্দর, বৃক্ষ-বল্লরী প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হইবে যেন সরলতা, কোমলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা তাহাদের সমস্ত শরীরে মাখিয়া রহিয়াছে। এমন ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের কোমল হৃদয় নিরীহ চরিত্র আর্য্যনন্দনগণ, পাশ্চাত্য রাজনীতিক কুটিলতা কঠোরতার ঘনাবরণে আবরিত পাশ্চাত্য ভাবের জাতীয়-জীবনের অনুকরণে গঠিত হইবার মত সৃষ্ট নহে। ভারতের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, আর্য্যজাতি বহু পূর্ব্বকাল হইতে জ্ঞানোন্নতির ফলস্বরূপে দৈহিক শক্তিকে উপেক্ষা করতঃ মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, তাই ভারতের ঐতিহাসিক যুগেও অসংখ্য মনস্তত্ত্ববিৎ ঈশ্বর-কল্প মহাসাধকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের ইতিহাস অধ্যাত্মবাদের সুবর্ণাক্ষরে রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন। ভারত পতনমুখে অগ্রসর হইবার কালেও যে

সমস্ত মহাত্মাগণ ভারত-মাতার বক্ষ শোভন করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির মহীয়ান চরিত্র জগতে অতুলনীয়। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া করিয়া ভারতবাসী নিজ দেহের শোণিতকণা পর্য্যন্ত ধর্ম্মানু-প্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ হয় সেইজন্য ভারতের ভদ্রলোকেরা Silver question বুঝেনা, কিন্তু কৃষকেরাও অনেক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝে।

অধুনা যুগান্তর কালব্যাপী ভারতীয় স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করার ফলে, ভারতে সমাজ ও ধর্ম্ম বিপ্লব সূচিত হইতেছে। এই প্রধূমিত বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপন করিয়া ভারতবাসী আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবন পুনরুদ্বোধিত করা কঠোরতর ত্যাগ-যজ্ঞাত্মক আয়াস সাধ্য। জানিনা কতদিনে কোন মহাপুরুষ আবির্ভাব হইয়া তাহা সম্পাদন করিবেন।

আমরা প্রসঙ্গাগত আলোচনায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অদ্য অধিক রাত্রি হইয়াছে চল আশ্রমে যাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্ম।

আর কবে হবে সে দিন উদয়।
গম্ভীর স্বরিতে ওঁ কার ধ্বনিতে
দিগন্ত ধ্বনিত হবে কবে হায়।
ঋষি সবে কবে যজ্ঞ কুণ্ডে বসি
ঢালিবে আহুতি স্বাহা স্বধা ভাবি
যজ্ঞ ধূমে ঢেকে যাবে দশ দিশি
ঋত্বিক গাহিবে বৈদিক ভাষায়।
ঘরে ঘরে হবে পূণ্য দেব গৃহ
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হবে অহরহঃ
বহিবে সংসারে আনন্দ প্রবাহ
পুণ্যের উদয়ে হবে পাপ ক্ষয়।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র সবে
আপন কর্ত্তব্যে মননিবেশিবে
দয়া ধর্ম্ম, ক্ষমা প্রীতি বৃদ্ধি হবে
এক লক্ষ্য মুখে চলিবে সবায়। *

---

* মূলতান—একতালা।

গানটী সমাপ্ত করিয়া দয়ানন্দ সম্মুখে উপবিষ্ট যোগজীবনকে কহিলেন,—সমাজস্থ নরনারিগণ অল্পাধিক পরিমাণে কর্ম্ম করিতেছে এবং তথা কথিত কর্ম্মের দ্বারায় যথা কথঞ্চিৎ শক্তিরও পরিচয় দিতেছে; তবে আবার শক্তি ও কর্ম্মহীনতা জন্য সমাজ বা দেশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে কেন, ইহা অত্যন্ত গুঢ়-রহস্য বিশিষ্ট চিন্তার বিষয়। উহা বুঝিতে হইলে ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনের বিরাট সাম্রাজ্য যে বিশেষ প্রকার কর্ম্ম ও শক্তিরূপ ভিত্তিভূমির উপরে স্থাপিত, সেই কর্ম্ম ও শক্তি বিষয়টা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

"কৃ" ধাতু "মন্" প্রত্যয় যোগে "কর্ম্ম" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ ক্রিয়া বা কার্য্য, অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহাকেই কর্ম্ম কহে, যে প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি আচরণ করিয়া মানুষ প্রকৃতই উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ তাহাকেই কর্ম্ম এবং অন্যথা আচরণকে অকর্ম্ম বা বৃথা কর্ম্ম বলিয়াছেন।

সুখ ও শান্তি বলিয়া আবহমান কাল হইতে যে দুইটী প্রচলিত কথা আছে, উহার অর্থ কি, তাহা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ দুইটী কথা লইয়াই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। জগতের প্রত্যেক মানুষ কেন—প্রত্যেক জীব-জন্তুও ঐ দুইটী বিষয় উপভোগ করিবার জন্য লালায়িত। জীবজগৎ কত কি উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঐ দুইটী বিষয় আয়ত্ত করিতে চাহে, এবং তাহারই জন্য জগৎ কর্ম্মশীল; নতুবা বোধ হয় কেহই কর্ম্ম করিত না।

একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর সহিত, একটী জীব অপর একটী জীবের সহিত, একটী মানব অপর একটী মানবের সহিত মিলিত হইয়া, যেন আপনার উত্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-সলিল সিঞ্চন করিতে চাহে। এই উদ্দেশ্যেই জগতের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে অক্লান্ত কর্ম্মকাণ্ড অভিনয় করিতেছে; কিন্তু কোথায় শান্তি—কোথায় সুখ; একটী পাইলে আর একটী চাহে, একটীর সহিত মিলিত হইলে আর একটীকে মিলাইবার জন্য জ্বলন্ত আকাঙ্খাপূর্ণ উদ্বেলিত হৃদয়ে সেই দিকেই ছুটিতে চাহে; অথচ সেই দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার পরিণাম ফল কেবল মাত্র নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতেছে। সেই অভাবের রুদ্র মূর্ত্তি প্রতিনিয়ত বিভীষিকা প্রসব করিয়া মানবকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহে; কিন্তু মানব-হৃদয় বীরত্বের আকর স্থান, মানব সেই রুদ্র মূর্ত্তির বিকট হাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সমস্ত জগতের জড় ও চৈতন্য হইতে আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য একটী একটী করিয়া বাছিয়া বাছিয়া কত কি আপনার সহিত মিলাইতেছে; ইহাই জগতের "কর্ম্ম।" কিন্তু যাহার জন্য কর্ম্ম, তাহা কোথায়। যাহার জন্য নগরে-প্রান্তরে, বনে-ভবনে, সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-ভোগী, গৃহী-বিরাগী জীব-জন্তু, জড় ও চৈতন্য লালায়িত, সেটী কোথায়? কেহ ঐহিকের জন্য, কেহ পারত্রিকের ধুয়া ধরিয়া অবিরাম কর্ম্ম-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া দিতেছে, কিন্তু কৈ সে সুখ বা শান্তি কোথায়? কোথায়ও নাই, কেন নাই বলিতে পার কি?

শুন,—ভালবাসা পাইয়া যে সুখ হয়, ভালবাসিয়া তাহা অপেক্ষা কোটী গুণ সুখ অনুভব করা যায়; সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণ করিয়া আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া বিশেষ কিছু সুখ হইবে না, বিন্দু মাত্রও অভাব দূর হইবে না; কিন্তু আপনাকে জগৎ ভরিয়া ছড়াইয়া দিতে পারিলে, অনির্ব্বচনীয় সুখ—অভাবনীয় শান্তি অনুভব করা যায়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রকৃতিদেবী অনন্ত অভাবের ও আকাঙ্খিতের মিলন কৌশল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমার অভাব পূরণের জন্য, তোমার আকাঙ্খিত মিলাইবার জন্য আপনার অপরিমেয় ভাণ্ডারের দ্বার চির-উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। ভ্রান্ত জীব তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না; তাই সে প্রকৃতির ভাণ্ডারকে আপনার অভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিতে চাহে, উহা ঠিক নহে। প্রকৃতি যেমন পরের জন্য আপনাকে চির-উন্মুক্ত রাখিয়াছেন. তুমিও যদি তাঁহার ন্যায় আপনাকে জগতের জন্য চির-উন্মুক্ত রাখিতে পার, তবে তোমার আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বিচূর্ণ হইয়া সার্ব্বজনীন প্রকীর্ণতা লাভ হইবে। এই প্রকীর্ণতাই মানবের অভাব উন্মোচন করিতে প্রকৃত সমর্থ। কারণ যখনে মানব জগৎ ভরিয়া আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারে, তখন সে আপনিই জগৎ; সুতরাং তখন তাহার আর চাহিবার—পাইবার কিছু থাকিবে না; কিন্তু মানুষের স্বভাব তাহার বিপরীত, তাই মানব চির-অভাবে উৎপীড়িত।

এই প্রকার প্রকীর্ণতা বা আমিত্বের প্রসার সাধন করা কেন—

অবধারণ করাও এক দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু এই প্রকীর্ণতা সাধন করাই প্রকৃত কর্ম্ম, এবং এই বিশিষ্ট কর্ম্ম প্রথাই মানবকে অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাই মানব সমাজের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ মানব সমাজকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য যে সমস্ত সামাজিক পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা আচরণ করিয়া, উন্নতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা আর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

আর্য্য সমাজের কর্ম্মকাণ্ডের এই বিশিষ্টতা, আমরা আর একটু বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য গীতার দুই একটী শ্লোক আলোচনা করিতে পারি। যথা,———

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন।—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

'হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদাই কর্ম্ম কর, কর্ম্ম দ্বারাই অকর্ম্ম পরাজিত হয়। যদি তুমি কর্ম্ম না কর, তবে তোমার শরীর যাত্রা পরিচালিত হইবে না অর্থাৎ তুমি ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।'

অবশ্য অর্জ্জুন জড়তা লাভ করেন নাই। সমস্ত ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রে বিশাল বাহিনী পরিচালনার ভার লইয়া, অসীম বলশালী দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে উপনীত অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর পার্থ, আত্মীয় স্বজনকে

নিহত করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হইলেও তাঁহার জড়তা নিষ্পন্ন হইতেছে না। স্বভাব-বশে তিনিও কর্ম্ম করিবেন; তবুও শ্রীভগবান সেই মহাবীরকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন, তাহা আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকারে বুঝিতে পারি।

প্রথমতঃ এই যে, সৎ বা অসৎ আহার বিহার প্রভৃতি কার্য্যের অনুরূপ ভাবে মানবের মনোবৃত্তি গঠিত হয় এবং দীর্ঘকাল অবধি একই ভাবে পরিচালিত মনোবৃত্তি, শরীরস্থ রক্তকণিকার উপরেও আধিপত্য বিস্তার করে; অর্থাৎ রক্তের মধ্যস্থিত জীবাণুগুলিকে সেই ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরায় উক্ত প্রকারের শোণিত জীবাণু পরিচালিত হইয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের দৈহিক ও মানসিক ভাব পরপুরুষগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষগণের দৈহিক ও মানসিক কার্য্য ও ভাব অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ঐ স্বভাব অবলম্বনে মানব অতি সহজে প্রাকৃতিকশক্তি ক্রমোন্নতি বিধানের মধ্য দিয়া উন্নতির পর উন্নতি, ক্রমে চরমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তাহার বিপরীত গতি মানবকে অবনত করে।

ওজঃশক্তির পরিচালনা অর্থাৎ সম্মুখ সংগ্রামে দৈহিক বল-পরীক্ষা, রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়জীবন পূর্ব্বকাল হইতেই উহার মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট। অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম-নিরত ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাঁহার তদনুরূপ কার্য্য করাই আত্মো-

ন্নতিকর। তদ্বিপরীত অর্থাৎ সহসাগত বিশুদ্ধ সত্ব বা তমোগুণ সম্ভূত কার্য্যস্পৃহা তাঁহার পক্ষে অনিষ্টকর। সুতরাং ঐ বিপরীত ভাবের কর্ম্মকে অর্জ্জুনের পক্ষে অকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকার অকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবন নষ্ট হইয়া যায়। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়সন্তান, ক্ষত্রিয়োচিত আহার বিহার দ্বারা তাঁহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট ; সহসা ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। কারণ, চির-চিন্তিত রাজ্যলিপ্সা এবং বলের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনার্থ দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় সহকারে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, স্বজনগণের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য এবং পরের অভাব স্মরণ করিয়া, স্নেহের স্বাভাবিক শক্তিতে সাময়িক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেও তাঁহার হৃদয় হইতে ঐ রাজ্যলিপ্সা একেবারে মুছিয়া যাইবেনা। উহা তাঁহার স্মৃতি পথে সমুদিত হইয়া, ভোগ ও লোভের স্বাভাবিক শক্তিতে তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে ; তাহার ফলে অর্জ্জুনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে। এই স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব স্মরণ করাইয়া অর্জ্জুনকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীভগবান কহিলেন ;—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

গীতা তৃঃ অঃ

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে উহা স্মরণ করে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছুক মিথ্যাচারণকারী এবং বিমূঢ়াত্মা কহে।

অবশ্য অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অন্ততঃ আহারাদি সংগ্রহের জন্যও কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু সূক্ষ্ম-তত্ত্বজ্ঞ ভবিষ্যদ্দর্শী মহামনস্বী ঋষিগণ কথিত শাস্ত্রানুযায়ী জাতি-ধর্ম্ম বিশেষে বিধি নিষেধানুরূপ কর্ম্ম-পদ্ধতি, যাহা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ দ্বারা আচরিত হইয়াছে, তাহাই অর্জ্জুনের সত্তা সংরক্ষক ও উন্নতি বর্দ্ধক কর্ম্ম। পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ প্রকার পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম-পদ্ধতি আচরণ দ্বারা মানব চরম উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। নতুবা চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রযুক্ত সহসাগত কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভয় বা স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোর অবনতি অভিমুখে পরিচালিত হয়। সুতরাং তৎকালোচিত জাতি ধর্ম্ম সবিশেষে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্ম, তাহার অন্যথা-চরণ অকর্ম্ম। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের শ্রেণী বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে উপদেশ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবান কহিলেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর॥

গীতা তৃঃ অঃ

'যজ্ঞার্থেই কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কর্ম্মদ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব হে পার্থ! নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম আচরণ কর।' কারণ এই যে, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে জল, জল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণিদেহ সৃষ্ট হয়, এবং ঐ প্রাণিদেহই সংসারের পুষ্টিসাধন করে।

ফল কথা এই যে, যাহাদিগের দ্বারা জগতের অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই প্রাণিদেহ পরিপুষ্ট করিবার জন্য অন্ন জলাদি স্থূল উপাদানগুলি যে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইতেছে; ঐ যজ্ঞই এক অংশে প্রকৃতিরূপে জগতের যাবতীয় আবশ্যক সৃষ্টি করিতেছেন—যাবতীয় অভাব পূরণ করিতেছেন, এবং অপর অংশে জীবনী শক্তিরূপে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন।*

চির-প্রবর্ত্তিত এই নিয়মানুসারে সংসার-চক্র পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; যেখানে এই বিধানের ব্যতিক্রম হয়, সেই খানেই সংসার ধ্বংস-মুখে পরিচালিত হয়।

প্রত্যেক মানব এই বিরাট বিশ্ব-সংসার-চক্রের এক একটী অংশ। উক্ত সংসারচক্রের যে অংশে যে অবস্থিত, সেই অংশে তাহার যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে; যখন তাহার দ্বারা সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন হয় না, তখন চক্রের সেই অংশটী শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্য্য-সমাজ বিশ্বব্যাপী বিরাট সংসার-চক্রের একটী ক্ষুদ্রতম অংশ, এবং তুমি আমি ঐ

---

*এই গূঢ়-রহস্য বিশিষ্ট বহু বিস্তৃত বিষয় অতি সংক্ষেপে বিবৃতি করা হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা প্রণীত রহস্য-মুকুর নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ইহা এবং অন্যান্য অনেক বিষয় বুঝিয়া আনন্দ অনুভব করা যাইবে।

ক্ষুদ্রাংশের এক একটী প্রত্যঙ্গ। তুমি সমাজের যে অংশে অবস্থিত, সেখানে থাকিয়া সমাজাঙ্গের পরিপোষণ জন্য যদি পূর্ব্ব কথিত প্রকারে "কর্ম্ম" না কর, তবে কেবলমাত্র যে তোমার অবনতি হইবে তাহা নহে ; তোমার দ্বারা সমাজের একটী অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, এবং তোমার কুসংসর্গ সংক্রামিত হইয়া সমাজের অন্যান্য অংশও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই দুর্ব্বলতাই সমাজ বা দেশ ধ্বংসের কারণ।

যোগ। "যজ্ঞ" অর্থ কি ?

দয়া। শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে "যজ্ঞ" অর্থ—বিষ্ণু। শ্রীধর-স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, ও আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকর্ত্তাগণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকের টীকায় "যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতে" ইত্যাদির দ্বারা উহারই সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ বিষ্ণু আরাধনারূপ কর্ম্মই "যজ্ঞ-কর্ম্ম"। "যজ্ ধাতু" ণ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে, উহার সাধারণ অর্থ---হোমাদির দ্বারা দেবতা অর্চ্চন। ভাবার্থ এই যে, কাহারও উদ্দেশ্যে স্বাচ্ছন্দ্য-চিত্তে স্বার্থত্যাগ করা। তবে, যজ্ঞ শব্দ নানাপ্রকারে—নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন জপ-যজ্ঞ (ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ) তপ-যজ্ঞ (স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন) আহুতি-যজ্ঞ (হোমাদি) ইত্যাদি। বিষ্ণুর সহিত ইহাদিগের সংস্রব রাখিতে হইলে এই প্রকার বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু-মন্ত্র জপ, বিষ্ণু-চরিত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং বিষ্ণুপ্রীতির জন্য হোমাদিতে আহুতি প্রদান ইত্যাদি।

যোগ। "বিষ্ণু" অর্থ কি বুঝিব ?

দয়া। বেবেষ্টি বিশ্বমিতি বিষ্ণু। যে মহীয়ান সত্ত্বা বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ অভ্রংলিহ শৈল-শিখর হইতে বালুকাকণা পর্য্যন্ত বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রত্যেক পরমাণুতে সত্ত্বা সংরক্ষিণী শক্তির বিকাশ করিয়া জগতের সজীবতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই বিশ্বব্যাপী জীবনীশক্তিকে "বিষ্ণু" কহে। কথাটী বুঝা কিছু কঠিন, আমি এ সম্বন্ধে পরে তোমাকে আরও কিছু বলিব ; তবে তুমি আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখ যে, বিষ্ণু সত্বগুণ বিশিষ্ট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা।

যজ্ঞক্রিয়ার ফলস্বরূপে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হয়। অধ্যাত্ম+ঞিক করিয়া "আধ্যাত্মিক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ আত্মাশ্রিত—আত্মা সম্বন্ধীয়। ফল কথা এই যে, যে ক্রিয়ার দ্বারা আপনার মধ্যে পরমাত্মারূপী ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহাকেই যজ্ঞ-কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই "ব্রহ্ম"ই অনন্ত অসীম জগদ্ব্যাপী অখণ্ড সত্বা দ্বারা বালুকাকণা হইতে শৈল-শিখর পর্য্যন্ত আত্মারূপে অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যজ্ঞ একই কথা। আমরা যাহাকে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতেছি, তাহাই ব্রহ্মার্থ কর্ম্ম।* কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার মধ্যে এই বিষ্ণুর বা ব্রহ্মভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, তিনি নিজেও অনন্ত অসীম জগদ্ব্যাপী এক বিরাট আমির

---

* ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ গীতা ৫ঃ অঃ

ফলাসক্তি শূন্য হইয়া যিনি কর্ম্মফল ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করেন, তিনি পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় পাপে লিপ্ত হয়েন না।

প্রতিকৃতি; তিনিই আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীনতা বা প্রকীর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার অভাব নাই, দুঃখ নাই, উদ্বিগ্নতা নাই। তিনি অনন্ত অসীম শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। তিনি প্রকৃতির উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি জয়ী হইতে পারেন। সুতরাং প্রকৃতিপ্রাদুর্ভূত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের, জড় ও চৈতন্য, জপ-মালার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত।

যে সমাজে এবম্প্রকার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়, সে সমাজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অনন্ত উন্নতির আবাসস্থল হয়। ঐ সমস্ত মহাপুরুষগণের অনুকম্পায় নানাবিধ আবিষ্ক্রিয়া ও জ্ঞান বিস্তার দ্বারা সমাজের যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইতে থাকে; প্রত্যুত ঐ মহাপুরুষগণের সংসর্গ প্রভাবে সমাজের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ উক্ত প্রকার যজ্ঞ-কর্ম্মের অল্পাধিক পরিমাণ অনুশীলন করিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে ফললাভে সমর্থ হয়, এবং এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সামাজিক লোক সমূহের পরার্থপর ত্যাগ-চেষ্টা দ্বারা, সমাজ পরস্পার সহানু-ভূতিপূর্ণ একপ্রাণ হইয়া উঠে, ও তাহারই ফলে দেশ অনন্ত সুখ-শান্তির আবাসস্থল হয়। ইহা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সমাজস্থ সাধারণের প্রতি উপদেশ।

এখন দেখ, শ্রীভগবান কর্ম্ম সমূহকে সাধারণতঃ শারিরীক ও মানসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টির সত্ত্বা সংবর্দ্ধক উপদেশামৃতপূর্ণ

স্বয়ম্ভূব বেদও তাহার অর্থবিৎ মহামনস্বী ঋষিগণ কথিত শাস্ত্র সম্মত বিধান মতে যথাবিহিত বর্ণ ও আশ্রম ধৰ্ম্মোচিত কর্ম্ম-পদ্ধতি দ্বারা জীবন পরিচালন করিতে অর্জ্জুনকে ও সাধারণকে অনুজ্ঞা করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, এই প্রকারে কর্ম্ম-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, সাৰ্ব্বজনীন প্রকীর্ণতা লাভ হইয়া মানবজীবন এক অনির্ব্বচনীয় সুখ-শান্তির আবাস স্থলে পরিণত হইতে পারে।

গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে, এই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত ভাবে কর্ম্মাচরণের নাম পুণ্য বা ধৰ্ম্মাচরণ এবং ইহার বিপরীত রূপ কর্ম্মাচরণকে অকর্ম্ম বা পাপাচরণ কহিয়াছেন। অকর্ম্ম বা পাপাচরণের ফল অভাব হইতে অভাব—অনন্ত অভাবে নিষ্পেষিত করিয়া মানবকে ধ্বংসমুখে লইয়া যায়, এবং কর্ম্ম বা পুণ্যাচরণের ফল মানবকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্বর্গ হইতে স্বর্গ, আনন্দ হইতে আনন্দ—অবিরাম আনন্দধারায় ভাসাইতে ভাসাইতে চিরস্থায়ীত্বের দিকে লইয়া যায়।

> "দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং।
> মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ॥
> উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং।
> শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ॥"
>
> মহাভারত, শান্তিপৰ্ব্ব।

'অর্থাৎ পাপাচারী দরিদ্র ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ, তথা ক্লেশ হইতে ক্লেশ, ভয় হইতে ভয়, পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত

হয়। আর শ্রদ্ধাবান, ধনাঢ্য, দাতা, পুণ্যাচারীজন, উৎসব হইতে উৎসব, সুখ হইতে সুখ, এবং স্বর্গ হইতে স্বর্গলাভ করে।'

মহাভারতে এখানে পাপাচারিগণকে দরিদ্র ও পুণ্যাচারিগণকে ধনাঢ্য বলিয়া উভয়বিধ আচরণের ফল বিবৃত হইয়াছে। দরিদ্রেরাই অভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং ধনীরাই সুখ-শান্তি উপভোগ করে।

এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্বভাব-বশে যথেচ্ছা কর্ম্ম করাকে প্রকৃত কর্ম্ম বলা যায় না; উহা অকর্ম্ম। যাহা অকর্ম্ম, তাহা মানবকে ধ্বংস-মুখে পরিচালিত করে। বর্ত্তমান ভারতে সমাজ ধ্বংসকারী অকর্ম্মের অত্যন্ত আবির্ভাব হইয়াছে, তাই এত অভাব—এত দুঃখ। ইহাই চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় আর্য্যসমাজে কর্ম্মের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। ভারতে আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবন উক্ত প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বনে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া, কালচক্রে কঠোররূপে নিষ্পেষিত হইয়া ও অদ্যাপি উহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর হিন্দুস্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল হইতে বৈদেশিক বিধর্ম্মিগণের কঠোর উৎপীড়নে ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবন শক্তিহীন, বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে সংস্কার করিয়া আর্য্যজাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে অভিলাষী হইলে, মহামনস্বী আর্য্য ঋষিগণের নির্দ্দেশিত পন্থাবলম্বন করিতে হইবে। পুরাভারতের ঋষিগণের অনুকরণে আবার ভারতের নগরে নগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; আর্য্য বালক-

বালিকাগণকে আশ্রম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে ; আবার ভারতে আর্য্য-জাতির গৃহে গৃহে দেবমন্দিরে সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টার শ্রবণমধুর রবে দিগন্ত নিনাদিত করিতে হইবে ; আবার আর্য্য-জাতির দ্বারে দ্বারে নিঃস্বার্থভাবে ভারতের পুরাবৃত্ত প্রচার করিতে হইবে। যিনি ইহা করিবেন, তিনিই ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ও প্রকৃত বন্ধু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—

"It is on the past that the future has to be moulded, this past will become the future, the more therefore the Hindus study the past the more glorious will be their future and whoever tries to bring the past to the door of every one, is a great benefactor to the nation."

'অতীতের অনুযায়ী ভবিষ্যৎকে গঠন করিতে হইবে। তাহা হইলে অতীত ভবিষ্যতের অনুরূপই হইবে। তজ্জন্য হিন্দুরা যতই তাহাদের অতীত বিষয় অধ্যয়ন করিবে, ততই তাহাদের ভবিষ্যৎ গৌরবান্বিত হইবে এবং যে কেহ এই অতীতকে প্রত্যেকের নিকট আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে, সেই এই জাতির একজন মহোপকারক বলিয়া গণ্য হইবে।

যোগ। আপনি এতক্ষণ যে সমস্ত জপ যজ্ঞাদির বিষয় বলিলেন, উহা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ; তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবন গঠনে শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র ধর্ম্মনীতি দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।

দয়া। তাহা নহে, জাতীয়-জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি সকলই আবশ্যক আছে। কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে, আর্য্য-জাতিকে "Indian Nation" করিয়া গড়িবার আবশ্যক নাই; আবশ্যক থাকিলে ও ফলের আশা সুদূর পরাহত। উহা-দিগকে সংস্কার করিতে হইবে। জীর্ণ প্রাসাদের পুনর্গঠন অপেক্ষা সংস্কার সহজসাধ্য। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তি গুরুভার উত্তোলনের চেষ্টা করিলে মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়া একে-বারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ শিথিল-শক্তি তোমরা, সুবিস্তৃত আর্য্যসমাজের পুনর্গঠনের প্রয়াস পাইয়া সমধিক শক্তিহীন হইতেছে। কোন মহীয়সী শক্তিশালী মহা-পুরুষের আবির্ভাব ব্যতীত উহার পুনর্গঠন নিতান্ত অসম্ভব। তোমরা বালকের প্রগল্‌ভতা পরিহার পূর্ব্বক উহার সংস্কার করিতে চেষ্টা কর এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া শক্তির উন্মেষ করিতে শিখ।

আর্য্যধর্ম্মনীতিকে অবহেলা করিও না। দুগ্ধের মধ্যে যেমন নানাজাতীয় খাদ্যের উপাদান লুক্কায়িত থাকে, ধর্ম্মনীতির মধ্যে সেই প্রকার সমস্ত নীতি নিহিত রহিয়াছে। কারণ "ধৃ" ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, "ধৃ" ধাতুর অর্থ—ধারণ করা; সুতরাং সংসার বা সমাজকে ধারণ করে—রক্ষা করে যে নীতি প্রবাহ, উহাকে ধর্ম্ম কহে। অতএব ধর্ম্মনীতির মধ্যে আবশ্যকীয় যাবতীয় নীতি নিহিত আছে। ধর্ম্মনীতি যাহার আয়ত্ত, বিশ্বসাম্রাজ্য তাহার করতলগত। পুরা-ভারতের বিস্ময়াবহ উন্নতির কথা যাহা শুনিয়াছ, এবং শিল্প

বাণিজ্য, স্থাপত্য, অস্ত্র ও আয়ুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি যাহার হেতুবাদ, সে সমস্তই ধর্ম্মপরায়ণ তপশ্চারী ঋষিগণ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মনে কর ভৃগু বশিষ্ঠের ন্যায় অস্ত্রবিৎ, পরাশর গর্গের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিৎ, ব্যাস বশিষ্ঠ ও ধৌম্যের ন্যায় রাজনীতি-বিৎ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, অশ্বিনীকুমারগণের ন্যায় আয়ুর্ব্বিৎ এবং বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় শিল্প ও স্থাপত্যবিৎ না থাকিলে, পুরা-ভারত কাহাকে লইয়া উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতেন? তাই বলি—পূর্ণমাত্রায় ধর্ম্মনীতির আলোচনা করিলে আবার ভারতে হাঁসির ফোয়ারা ছুটিবে, আনন্দের ধারা বহিবে, আবার ভারতের তমসাচ্ছন্ন ভাগ্য-গগন আলোকিত হইয়া উঠিবে।

অদ্য রজনী অধিক হইয়াছে আশ্রমে চল বলিয়া দয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শক্তি।

জাগগো জননী তুমি
নতুবা সকলি যে যায়।
তুমি না জাগিলে বল
কেমনে রজনী যায়!
বুক ভরা তমোরাশী ঢেকে আছে দিবা নিশি,
ঘুচাও আলো প্রকাশি,
কর দূর দীনতায়।
যেথায় খেলিতে ব'সে গিরি প্রবাহিনী পাশে
অঞ্চল উড়ায়ে বাতাসে
সাগর সৈকত গায়।
(সেথা) জাগ—খেল ফুল্লমনে সত্ত্ব রজঃ গুণ সনে,
জাগাও দীন সন্তানে,
নিবেদি রাতুল পায়।*

---

* পূরবী—একতালা।

শীকর-সম্পৃক্ত সান্ধ্য-সমীরণে সুরধুনী তীরে সমাসীন দয়ানন্দ মৃদু মধুর স্বরে গানটী গাহিয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে নীরবে চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে উপবিষ্ট যোগজীবন উভয়ের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কর্ম্ম" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম, কিন্তু শক্তিহীনতা কি করিয়া বুঝিব। "শক্তির" আবার কর্ম্মের ন্যায় প্রকার ভেদ আছে না কি?

দয়া। তুমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। কর্ম্মের সহিত শক্তির অত্যন্ত নিকট অর্থাৎ সাধ্য সাধক সম্বন্ধ। সুতরাং "শক্তি" কথাটী ভাল করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক।

কর্ম্মের ন্যায় শক্তিরও প্রকার ভেদ আছে। শক্তির প্রকার ভেদ আছে বলিয়াই কর্ম্মের প্রকার ভেদ হয়; কারণ কর্ম্ম সাধনের একমাত্র মৌলিক উপাদান "শক্তি"; শক্তির ভাবানুসারেই কর্ম্মের ভাব হয়।

"শক্" ভাববাচ্যে "ক্তি" যোগে "শক্তি" শব্দ সাধিত হইয়াছে। উহার আভিধানিক অর্থ সামর্থ্য, উৎসাহজ, প্রকৃতি ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিবার মত অন্য কোন প্রতিশব্দ নাই। শক্তির প্রতিশব্দ "শক্তি"। আর্য্য দার্শনিকগণ শক্তিকে "প্রকৃতি" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকরোতীতি—"প্রকৃতি"; অর্থাৎ নানাবিধ প্রকরণ (ক্রিয়া) প্রকৃষ্টরূপে সাধন করেন, এই ভাবার্থ অবলম্বনে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দার্শনিক আদিবিদুষ কপিলঋষি, বিরাট বিশ্ব-সাম্রাজ্য সৃষ্টির মৌলিক উপাদানস্বরূপা সত্ত্ব রজস্তমঃ গুণাত্মিকা শক্তি-

কেই প্রকৃতি বলিয়া বিবৃতি করিয়াছেন। এই গুণগুলিই জাগতিক কার্য্যসমূহের মূলভিত্তি। গুণ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিশিষ্ট, সুতরাং গুণাত্মিকা শক্তিও ভিন্ন ভিন্ন ভাব-সমষ্টি। এখন দেখ, গুণ সমূহের বিষমতাযুক্ত বিক্ষোভ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় বলিয়াই জগতের জড় ও চৈতন্য সর্ব্বত্রই—এমনকি প্রত্যেক বালুকাকণার মধ্যেও ঐ গুণ-বিক্ষোভ অর্থাৎ শক্তির তরতম রূপ প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগ। গুণবিক্ষোভ কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

দয়া। সৃষ্টি কালে গুণ সমূহের মধ্যে একটী অপরটীকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, এবং যে গুণটী প্রবলতা লাভ করে, সেই ভাব বিশিষ্ট একটী সৃষ্টির আবির্ভাব হয়; ইহাকেই গুণ-বিক্ষোভ বলে। কথাটী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, গুণগুলি স্বভাবতঃ গতিশক্তি বিশিষ্ট, কিন্তু একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না; সুতরাং মনে কর যে, তিনটী গতিস্মাণ পদার্থ একত্রে জড়িত ভাবে চলিতে চেষ্টা করিলে, একটীর সহিত আর একটীর ঘাতপ্রতিঘাতজনক অবস্থা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একটীর আঘাতে আর একটী বা দুইটী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তিনটী গুণের মধ্যে কোন একটী অপর দুইটী হইতে প্রবলতা লাভ করে; তখনই সেই প্রবল গুণাত্মক একটী সৃষ্টির আবির্ভাব হয়; প্রত্যুত অপর দুইটী দুর্ব্বল ভাবও তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়। এই প্রকারে প্রকৃতিরূপা আধার হইতে সত্ত্ব প্রধান, রজঃ প্রধান,

তমঃ প্রধান এবং মিলিত ভেদে নিরন্তর বিবিধ জাতীয় সৃষ্টি সমুদ্ভাবিত হইয়া বিশ্ব-সাম্রাজ্যের অঙ্গ বর্দ্ধন করিতেছে।

যোগ। গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝাইলে ভাল হইত। যাহা হউক আপাততঃ কোন গুণের কি প্রকার ক্রিয়া তাহাই বলুন।

দয়া। সত্য, কথাগুলি অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্ব; ইহা একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলে বুঝিতে সুবিধা হয়, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় হইতে বড় অনেক দূরে গিয়া পড়িতে হইবে; সুতরাং পরে আমি তোমার নিকট জ্ঞান-যোগ বিবৃতি করিব।* তাহা হইলে তুমি সহজেই ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গুণ সমূহ, তত্ত্ব সমূহ, ভূত সমূহ, তাহা হইতে সৃষ্টিপ্রকরণ, ক্রমে জীবদেহ, জীবদেহের জীবিতাবস্থা, জীবের পরিণাম পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা প্রভৃতি সহজে বুঝিতে পারিবে। ঐ বিষয়গুলি এত মনোরম যে, একবার শুনিলে সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করা যায় না। সে যাহা হউক এখন গুণ সমূহের কাহার কি ক্রিয়া তাহা শুন।

গুণ সমূহ সৃষ্টি দ্বারা যখন বহির্জগতে প্রকাশ পায়, তখন আমরা তাহাদিগকে সাধারণতঃ আকর্ষক, বিকর্ষক ও সংযমাত্মক শক্তি নামে অভিহিত করিতে পারি। আকর্ষক শক্তি তমোগুণ; উহা যেন মানবের সত্ত্বাসংবর্দ্ধক ভাব-প্রবাহকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আকর্ষণ করিয়া নিস্তেজরূপে ঘনীভূত

* রহস্য-মুকুর নামক গ্রন্থে জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

করিতে থাকে। মোহ, নিদ্রা, আলস্য, ভ্রম, উন্মাদ, প্রভৃতি তামসিক কার্য্য। বিকর্ষক শক্তি রজোগুণ, ঐ আকর্ষক কেন্দ্র হইতে পরমাণু সমূহকে বাহিরের চারিদিকে বিকর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ ছুটাইয়া দিতেছে। আকাঙ্খা, ছুটাছুটি, ব্যস্ততা, তীব্রতা, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি রজোগুণের ক্রিয়া। এই উভয়ের সংযম-কারক, অর্থাৎ নিরাকাঙ্খ, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, অথচ ভ্রম, মোহ, নিদ্রা, আলস্যবিহীন লঘু ও প্রকাশশীল অর্থাৎ জ্ঞানময় অবস্থা সত্বগুণের কার্য্য। এই গুণ সমূহই মানবজীবন পরিচালন-কারিনী মহাশক্তি। মানব মাত্রেই এই শক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে। প্রত্যেক মানবের মধ্যে এই তিনটী শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন যাহার মধ্যে ইহার যেটীর প্রবলতা উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি তদ্গুণোচিত কার্য্য করে।

আমরা দেখিতে পাই কখন কাহার মধ্যে তমোগুণ প্রবল হইয়া পড়িল, সে তখন কোন এক ভাবের দাস হইয়া নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্যে অভিভূত কর্ম্মহীন জীবনযাপন করিতে লাগিল। কখনও বা কাহার মধ্যে রজোগুণের আবির্ভাব হইয়া তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মপ্রিয় করিয়া তুলিল। আবার কেহ বা সত্বগুণের প্রভাবে ধীর, শান্ত, সন্ধ্যা-বন্দনাপ্রিয় দেবভক্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রকার গুণ-বিক্ষোভ দ্বারা মানব নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতার প্রভাবে কেহ নিম্ন হইতে উচ্চে আরোহণ করিতেছেন, কেহবা উচ্চ হইতে নিম্নে অবরোহণ করিতেছেন।

যোগ। উন্নতি জগতের স্বাভাবিক নীতি, সকলেই উন্নত হইতে চাহে। সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি রজস্তমঃশক্তি অতিক্রম করিয়া উন্নীত হইয়া আবার অধঃপতিত হইবেন কেন?

দয়া। "কেন।" এই কৈফিয়তের উত্তর দেওয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ বুঝাইতে হইলে এত অধিক কথা বলিতে হইবে যে, তাহাতে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং তুমি উহা সাধারণতঃ এইরূপে বুঝিতে পার যে, সংসর্গ প্রভাবেই মানুষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থ উপার্জ্জন করিলেই ধনবান্ হওয়া যায় না, উহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়; যাহাতে দস্যু তস্করে কাড়িয়া লইতে না পারে। সাত্বিক ভাববিশিষ্ট ব্যক্তি কষ্টে যাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তদপেক্ষা হীন সংসর্গ হইতে দূরে রাখিতে না পারিলে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাকে অবনত করিয়া ফেলিবে। জড়ই হউক বা চেতনই হউক, যে প্রকার সংসর্গে অধিক কাল থাকিতে হইবে, মানব-প্রকৃতি তাহার অনুরূপ ভাবে গঠিত হইবে। সংসর্গ অত্যন্ত অলক্ষিত-ভাবে মানব-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে আপনার দিকে টানিয়া আনে। সুতরাং কোনও ভাল মানুষ যখন কুসংসর্গে পড়ে, তখন সে মন্দ হইয়া যায়; আবার কখন কোন মন্দ মানুষ সৎসংসর্গ প্রাপ্ত হইলে ভাল হইয়া উঠে।

এখন বুঝিয়াছ যে, কর্ম্ম করিবার জন্য যে শক্তি আবশ্যক, তাহা এই সত্বও রজস্তমোগুণে, এই গুণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই মানব কর্ম্ম করে, তাই কর্ম্মও সাত্বিক, রাজসিক,

তামসিক ভেদে বিভিন্ন ; এবং এই গুণ সমূহকেই যখন প্রকৃতি বা শক্তি বলা হয়, তখন যে জাতীয় কর্ম্ম সাধন করা কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে উপযোগী, সেই জাতীয় গুণের অভাব হইলেই মানব কর্ম্ম-শক্তিহীন হয়।

যোগ। আপনি বলিয়াছিলেন যে, গীতায় শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি আর একবার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মনীতির অত্যাধিক আলোচনা আবশ্যক। ভাল এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?

দয়া। কিছুই নহে। ঋষিগণের কথিত ধর্ম্মনীতির দ্বারাই শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্র শব্দ "শাস্ + ত্র" করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শাস্" ধাতুর অর্থ শাসন। সুতরাং ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ সংরক্ষক নীতিপূর্ণ কর্ম্ম-পদ্ধতি দ্বারা সমাজকে পরিচালন করিবার জন্য যে শাসন বাক্য ঋষিগণ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, উহাই কালক্রমে গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যোগ। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রায়াশঃই জপ, যজ্ঞ, ধ্যান, ধারণা, সন্ধ্যা, পূজার উপদেশেই পরিপূর্ণ ; ঐ গুলি বোধ হয় সত্বগুণের কার্য্য। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে একমাত্র সত্বগুণের বা সাত্বিক শক্তিরদ্বারা সমাজ গঠিত হউক।

দয়া। না তাহা বলিতে চাহিতেছি না ; কারণ তাহা অসম্ভব। ভাল, তুমি যেমন শাস্ত্র মধ্যে জপ, যজ্ঞাদি সত্ব-গুণাত্মক কার্য্যের উপদেশ দেখিয়াছ, তেমনই যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রজা-

পালন, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি রাজসিক কার্য্যের উপদেশ কি দেখিতে পাও নাই ?

যোগ। পাইয়াছি। সত্বগুণই যখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তখন সমাজকে বিশুদ্ধ সত্বগুণের দ্বারা গঠন করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি ?

দয়া। অবশ্য এক শ্রেণীর লোকে তাহাই চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ রজোগুণের কার্য্য কর্ম্ম-শীলতা লোপ পাইলে অন্নাচ্ছাদনের অভাব ঘটিবে। বিশেষতঃ অজ্ঞ ও অসমর্থদিগের মধ্যে কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক সত্বগুণ বর্দ্ধনের চেষ্টা পাইলে, তমোগুণের প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রেণী বিশেষ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উহাতে সমাজের উন্নতি সাধন হয় না, বরং সমাজের অধঃপতন হয়। রজোগুণের মধ্য দিয়া সাত্বিক ভাব গঠন না করিলে, সেই সাত্বিক ভাব পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয় না। আর এক কথা এই যে, তামসিক ভাবাপন্ন লোক সমূহ উন্নীত হইয়া রজো-গুণান্বিত হইতে পারে ; একেবারে সাত্বিক ভাবে গঠন করিতে প্রয়াস পাইলে তাহাদিগের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

যোগ। তবে কি একমাত্র রজোগুণাত্মক কার্য্য-পদ্ধতি বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী ?

দয়া। তাহাও নহে। অবশ্য বর্ত্তমানে একশ্রেণীর লোকে ঐ প্রকারেই বর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে এক অভিনব জাতি (Nation) করিয়া গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; তাহার ফলও অত্যন্ত খারাপ হইতেছে। কারণ সত্বগুণ

উপেক্ষিত রজোগুণ প্রবল মানব অত্যন্ত কর্ম্মশীল হইলেও মূঢ়ভাবাপন্ন, আত্মগর্ব্বিত, স্বার্থপরায়ণ হয়। উহারা নিজের স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না। বিশেষতঃ রজোগুণ অধিকতর বর্দ্ধিত হইলে, উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাদন করে, এবং তাহারই ফলে তমোগুণ জন্মিয়া উঠে।

যোগ। তবে কি উপায়ে আধুনিক ভারতের কর্ম্ম-পদ্ধতি গঠিত হইবে?

দয়া। তাহা শাস্ত্রেই নির্দ্দেশিত রহিয়াছে, তবে কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে উহার কোনও কোনও প্রত্যঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমান দেশের অবস্থানুসারে সত্ত্ব ও রজঃ উভয় গুণের সম্মিলনের এক ভক্তিপূর্ণ জ্ঞানাত্মিকা কর্ম্মময়ী মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া চিরনিদ্রার অন্ধতমসাচ্ছন্ন ক্রোড় হইতে ভারতকে জাগাইতে হইবে এবং আলোকে আনিতে হইবে।

সরলতা, সমপ্রাণতা, পরদুঃখকাতরতা এবং তাহার জন্য নিঃস্বার্থে আত্মত্যাগ, শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য তিতিক্ষা, পবিত্রতা, সংযম, নিয়ম প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য। কঠোর শ্রমশীলতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, কর্ম্মব্যস্ততা, প্রতিযোগিতা এবং উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি রজোগুণের কার্য্য। সমাজের ব্যক্তিবর্গ উক্ত প্রকার অর্থাৎ সাত্ত্বিক এবং রাজসিক সম্মিলিত গুণ দ্বারা বিভূষিত না হইলে অধঃপতিত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

পুরাভারতের আর্য্য মনীষিগণের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফল-

স্বরূপ লোক শিক্ষাকর পুরাণ সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি এই প্রকার সাত্বিক ও রাজসিক শক্তির সম্মিলনে সংগঠিত, এবং পুরাভারতের অসীম উন্নতিকর আশ্রম-ধর্ম্ম এই প্রকার শক্তিজাত সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই আধুনিক তোমরা স্বেচ্ছাচার প্রযুক্ত আশ্রমধর্ম্মের অবমাননা পূর্ব্বক আপন আপন সর্ব্বনাশ সাধন করিতে করিতেও অদ্যাপি উহার অস্তিত্ব লোপ করিতে পার নাই। তাই বলি, যদি তোমাদের ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে উন্নতির পথে পুনরগ্রবর্ত্তী করিতে ইচ্ছা কর, তবে সরলপ্রাণে ভক্তি ও সম্মান সহকারে পুরাভারতের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হও।
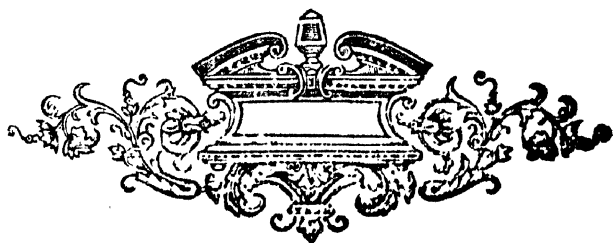
ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতি ভেদ।

(তুমি) আবার নাচিতে শ্রীবাস অঙ্গনে
গাহিতে মধুর স্বরে কৃষ্ণ নাম।
(তবে) আবার বুঝি বা এ শুষ্ক মরুতে
জাগিয়া উঠিত সরস প্রাণ,

তব গুণ গানে হ'য়ে অনুরক্ত,
নাচিয়া উঠিত তোমার ভক্ত;
হৃদয়ে হৃদয়ে হইত মিলিত,
মরম তন্ত্রীতে বাজিত তান।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র মিলি,
সাধনার ক্ষেত্রে হ'য়ে গলাগলি;
আনন্দে মাতিয়া দুই বাহু তুলি
ডাকিত' তোমারে ভরিয়া প্রাণ।*

দয়ানন্দের গানটী সমাপ্ত হইলে যোগজীবন কহিলেন,—

আমার বোধ হয় যে, সমাজ নিয়মনের ব্যবস্থাও মূলে ততটা ভাল হয় নাই।

দয়া। কি দোষ হইয়াছিল তাহা কি বলিতে পার?

যোগ। "জাতি ভেদ"। শক্তি ও গুণ যখন সমস্ত মানবের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তাহার উদ্বোধন করিতে

---

* ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা।

তাহার উদ্বোধন সাধন করিতে পারিলে, যে কেহ তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না কেন? এ জাতি এটী করিবে, ও জাতি ওটী করিবে, তাহার অর্থ কি? ইহাতে এই বুঝা যায় যে, এক জাতি আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য অপর জাতিকে হীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন; তাই জাতিতে জাতিতে স্বভাব-সুলভ হিংসা-দ্বেষ সংঘটিত হইতেছে, এবং তাহারই ফলে জাতীয়-জীবনে বিপ্লবের সূত্রপাত হইতেছে।

দয়া। জাতি-ভেদ সামাজিক উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ। জাতি-ভেদ ছিল বলিয়া আর্য্য-সমাজ এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহা কেহ প্রবর্ত্তন করে নাই; স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃতি যদি কিছু ভূল করিয়া থাকেন, তাহা কে সংশোধন করিবে?

যোগ। তা বটে,—কিন্তু প্রকৃতি ভূল করিয়াছেন, এ কথাটা কি সঙ্গত হয়?

দয়া। না,—প্রকৃতি ভূল করেন নাই। প্রকৃতির অভ্রান্ত ইচ্ছাবশেই মানব, মানবের সমাজ এবং সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানবের জাতি-ভেদ সৃজিত হইয়াছে।

যোগ। জাতি-ভেদ দ্বারা সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় কি প্রকারে? এ কথাটা ভারতের লোকের নিকটেই শুনা যায়; অন্য দেশের কেহ এ প্রকার কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু মানব-সমাজ কি পৃথিবীর অন্য দেশে নাই?

দয়া। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে তাহাদিগের প্রকৃত গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে

পার নাই। আমি তোমাকে পাশ্চাত্য দেশের কথা পাশ্চাত্য মনস্বী পণ্ডিত-কেশরী Spencer (স্পেনসার) সাহেবের দুই একটী অভিমত শুনাইয়া বুঝাইয়া দিতেছি ; তাহা হইলে তোমার সন্দেহের কারণ রহিবে না।

"You need but to look at the changes going on around, or observe social organisation in its leading peculiarities to see that these are neither supernatural, nor are determined by the wills of individual man as by implication historians commonly teach ; but are consequent on general natural causes, the one case of division of labour suffices to show this." (Spencer essays.)

'চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও সামাজিক নিয়মের কার্য্যকরী বিশেষত্ব দেখিলে বোধ হয় যে, ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ যেরূপ বলেন, উহা সেরূপ অস্বাভাবিক অথবা ব্যক্তিগত দৃঢ় ইচ্ছাপ্রসূত নহে, কিন্তু স্বাভাবিক। শ্রম-বিভাগের দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝা যায়।'

যোগ। শ্রম-বিভাগ দ্বারা জাতি-ভেদ হইল কি প্রকারে ; এক জাতির মধ্যে পাঁচ জনে কি পাঁচ প্রকারের কার্য্য করে না ?

দয়া। কি প্রকারে জাতি-ভেদ হইয়াছে, তাহা শুনিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

'গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারি বর্ণের (জাতির) সৃষ্টি করিয়াছি।'

আমি গত কল্য তোমাকে বলিয়াছি, গুণ-সমূহ স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক ভাব-বিশিষ্ট এবং ঐ গুণ-সমূহের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি হয় বলিয়াই, জাগতিক পদার্থ মাত্রেই পৃথক পৃথক ভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মানবগণের মধ্যেও সেই প্রকার বিভিন্ন ভাব পরিদৃষ্ট হইবে। এই গুণ-সম্ভূত ভাবগুলি মানবের প্রবৃত্তির দ্বারা প্রস্ফুট হয়, এবং মানব মাত্রেই এই প্রবৃত্তি-বশে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যে আসক্ত হয়। এখন দেখ, একজন ব্রাহ্মণ, তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাহার প্রবৃত্তি শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান, ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতা, আর্থিক বা শারীরিক সুখে বিরক্তি প্রভৃতি গুণ-নিচয়ের দ্বারা বিভূষিত, এবং সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি তাহার কার্য্য। আর একজন বৈশ্য,—তাহার প্রবৃত্তি উহার বিপরীত, অর্থাৎ অর্থান্বেষী, ভোগলিপ্সু, সুতরাং স্বার্থযুক্ত, কূটবুদ্ধি, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ-নিচয়ে বিভূষিত; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি তাহার কার্য্য। একজন ত্যাগী,—অপর ভোগী, একজন সুখ-বিরাগী,—অপর সুখানুরাগী, একজন পরার্থপর,—অপর স্বার্থ-বান্। এ উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রণয় কেন—সহানুভূতিও সম্ভব নহে। এই প্রকারে একজন তেজস্বী, স্বাধীনতা-প্রিয়, দূরদর্শী, কূট-নীতিজ্ঞ, রাজ্যলিপ্সু ক্ষত্রিয়ের সহিত এক-জন অদূরদর্শী, কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসাপরায়ণ, দাসত্বজীবী,

হীন-স্বভাব শূদ্রের সহিত কি সম্মিলন হওয়া সম্ভব? প্রত্যুত, জগতের জীব মাত্রই কাহারও না কাহার সহিত মিলিত হওয়া—কাহারও না কাহার সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং, সম-ধর্ম্মাক্রান্ত, সম-প্রবৃত্তি-যুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের স্বভাব-সুলভ সহানুভূতির জন্যই দল-বদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

সত্ব-গুণ-প্রধান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ উপাধি গ্রহণ করিয়া এক-সমাজ-বদ্ধ—শ্রেণী-বদ্ধ হইলেন। এই প্রকারে রজোগুণ-প্রধান হেতু ক্ষত্রিয়, রজস্তমো-গুণ-প্রধান হেতু বৈশ্য, তমোগুণ-প্রধান হেতু শূদ্র উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ আপন আপন স্বভাবানুযায়ী কার্য্যের দ্বারা, আপন আপন জীবিকার্জ্জনের জন্য সহানুভূতির প্রত্যাশায়, সম-স্বভাব ও সম-কার্য্যানুরক্ত ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক একটী পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন।

"বৃনহ্" ধাতু হইতে ব্রাহ্মণ, "ক্ষদ্" ধাতু হইতে ক্ষত্র, "বিশ্" ধাতু হইতে বৈশ্য, "শুচ্" ধাতু হইতে শূদ্র শব্দ সাধিত হইয়াছে। তুমি এই ধাতুগুলির অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, জাতিগত উপাধির অর্থের দ্বারা জাতীয়-চরিত্রের আভাস প্রকাশ করিতেছে। এই প্রকার চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য মানবে মানবে যে পার্থক্য, তাহাই জাতি শব্দের দ্যোতক। এখন বুঝিয়াছ, গুণ-ভেদ হেতু বর্ণ বা জাতির ভেদ স্বাভাবিক।

যোগ। জাতি-ভেদের দ্বারা সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা উন্নতি বর্দ্ধিত হয়, এ কথা কি Spencer বলিয়াছেন?

দয়া। হাঁ—বলিয়াছেন। তুমি Spencer কৃত Sociology নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিলে তাহা জানিতে পারিবে। আমি আপাতত তোমাকে একটু শুনাইতেছি।

"Social progress is supposed to consist in the produce of a greater quantity and variety of the articles required for satisfying men's wants; in the increasing security of person and property in widening freedom of action; whereas rightly understood, social progress consists in those changes in the structure of social organism, which have entailed these consequences."

'মানুষের সম্পত্তি ও প্রতিভূর পরিবর্দ্ধন এবং প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করিতে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করিলে সামাজিক উন্নতি সংঘটিত হয়। শ্রেণীগত কার্য্যের স্বাধীনতা ও সীমা-বন্ধতার দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই প্রকার বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সামাজিক উন্নতি রক্ষিত ও অবধারিত হইতেছে।'

ফল কথা, যাহার ইচ্ছায় মানব জাতির সৃষ্টি হইয়া এই মরজগতের অতুলনীয় শোভা ও পূর্ণতা বর্দ্ধন করিতেছে,—বিজ্ঞাপন করিতেছে, মরজগতের—মানবের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য তিনিই নানাবিধ সৃষ্টির আবির্ভাব করিয়াছেন। মানবের প্রয়োজন বহু, সুতরাং বহু আবিষ্কারেরও আবশ্যক। সেই হেতু প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে বহু-বুদ্ধি-বিশিষ্ট বহুলোক, তাহাদিগের পৃথক পৃথক রুচি এবং পৃথক পৃথক কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া মানব

জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিতেছে।

যোগ। পাশ্চাত্য দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু সে দেশে জাতি-ভেদ নাই কেন?

দয়া। কে বলিল তোমায়, তথায় জাতি-ভেদ নাই। Spencer সাহেবের আর একটী অভিমত শুন।

"Some men have become manufacturers, others have remained cultivators of soil. In Lancashire, millions have devoted themselves to the making of cotton fabrics. In Yorkshire, another million lives producing woollens; and pottery of Sheffield, the hardwar e of Birmingham severrally occupy their hundreds of thousands. These are large facts in the Structure of English Society; but we can ascribe them neither to miracle, nor to legislation."

'কতকগুলি মানুষ দ্রব্যজাত প্রস্তুত করে, এবং কতকগুলি শস্যাদির চাষ করে। ল্যাঙ্কেশায়ারে হাজার হাজার লোক কার্পাস সূত্র ও বস্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। ইয়র্কশায়ারে হাজার হাজার লোক পশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, শেফিল্ডে বাসনাদি নির্ম্মাণ করিয়া, এবং বার্ম্মিংহামে ধাতু-নির্ম্মিত কঠিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে। সুবৃহৎ ইংরাজ সমাজের আকৃতি এইরূপ। আমরা ইহাকে অস্বাভাবিক বা আইনের ফল বলিতে পারি না।'

এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্রই শ্রেণীগত পার্থক্য বা জাতি-ভেদ পরিলক্ষিত হইবে।

যোগ। আমাদের দেশের জাতি-ভেদ গুণ-ভেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, একথা এখন আর কে চিন্তা করিয়া থাকে? এখন জলে এবং বিবাহে জাতি-ভেদ পর্য্যবসিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ এই সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত উদারতা প্রদর্শন করেন।

দয়া। পাশ্চাত্য চরিত্রের আচার-গত অবস্থার সহিত প্রাচ্য চরিত্রের ব্যবহারিক তুলনা করিও না। সদ্ব্যবহার দ্বারা সভ্যতা প্রকটিত হয়, সত্য; কিন্তু তুমি কি মনে করিতে চাহ যে, প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? প্রাচ্য-দেশবাসী আর্য্যজাতির সভ্যতা, দূর-দৃষ্টি-প্রসূত যে সমস্ত মৌলিক চিন্তা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে.— কোনও সমাজে, কোনও জাতি সে প্রকার মৌলিক চিন্তা অবধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই আর্য্য সমাজ ও আর্য্য সভ্যতা, যুগান্তর কাল হইতে সহস্র সহস্র বিপ্লব-বাত্যার ভীষণতর আক্রমণ অতিক্রম করিয়াও অদ্যাবধি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাতন আসিরীয়, রোমীয়, গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি জাতির কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তাহারা সভ্যতার রঙ্গভূমে দুই চারি দিনের জন্য বিস্ময়কর জাঁক-জমক দেখাইয়া, কাল-স্রোতে আপনাকে হারাইয়া বসিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ব্যতীত আজ আর কোথাও কি তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাও? যে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিত্রে আজ তোমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে—

মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া গিয়াছে, প্রাণ উধাও হইয়া সেই দিকে ছুটিতে চাহিতেছে, সেখানকার কুসুম-গুচ্ছ-শোভিত আতর-এসেন্স-সুরভিত দুগ্ধ-ফেননিভ-শয্যা-বিরাজিত প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র হইতে,—বিস্ময়কর বিস্ফোরক-ধূমায়িত, কামান-গর্জ্জিত, অসি-ঝনিত, অশ্ব-হ্রেষিত, আহত-ধ্বনিত রণাঙ্গন পর্য্যন্ত অনু-সন্ধান কর, দেখিবে,—কোথায়ও সে সভ্যতার প্রাণ নাই। সর্ব্বত্রই লোক-নয়নের বিস্ময়-জনক ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় প্রতারণার প্রবল প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। আর, প্রাচ্যের বাসন্ত-ব্রততির স্বভাব-সুলভ কোমলতা-কল্পিত পাদপ-তলে শাকান্ন-ভুঞ্জিতা বৃক্ষ-বল্কল-পরিহিতা অতিথি-সৎকার-রতা শকুন্তলার প্রণয়-ব্যথিতা লজ্জা-ম্রিয়মাণা ক্ষুদ্র হৃদয়খানির অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়া, করাল-বদনা ঘোর-রূপী রণ-চণ্ডিকার লীলা-ক্ষেত্র ভারতীয় সমরাঙ্গনের চিত্রের দিকে এক-বার মানস-নয়নে চাহিয়া দেখ,—বিস্মিত হইবে, ভ্রান্তি দূর হইবে।

অনেক কথা বলিয়াছি। এখন কাজের কথা শুন। অসবর্ণ বিবাহ, এবং নিম্নবর্ণের আহার্য্য-গ্রহণের ব্যবস্থা, পূর্ব্বে আর্য্য সমাজেও ছিল। যাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভাব জাগরূক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও যাঁহারা আপনার শক্তি-প্রভাবে ঐ প্রকার অসবর্ণ সম্মিলনের দূষিত ভাব-গুলি সামলাইতে সমর্থ হইতেন—আপনার অভ্যন্তরস্থ ভাল ভাবগুলি রক্ষা করিতে সমর্থ

হইতেন, কেবল তাঁহারাই সেই প্রকার কার্য্যে অগ্রসর হই-তেন,— সাধারণে নহে।

যোগ। যাঁহারা "শক্তির" দোহাই দিয়া মন্দটীও গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে শক্তির প্রভাবে হীন-শক্তিগণকে আপনাদিগের ইচ্ছামত চালিত করিতেন না, এ কথা কে বলিবে। আর্য্যজাতির ব্যবহার-শাস্ত্রগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রণীত। সে গুলি অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের প্রয়োজনপূরণের জন্য রাজার সাহায্যে তাঁহার সমস্ত সমাজকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাসন করিতেন।

দয়া। শক্তির দোহাই দিয়া নহে,—শক্তির প্রভাবেই সত্য। তবে—সে শক্তি মানসিক শক্তি। তাহার প্রভাব নিজের উপর প্রতিফলিত করা যায়। লোক-সঙ্ঘের উপর প্রয়োগ করিবার মত শারীরিক শক্তি ব্রাহ্মণগণের কোন দিনই ছিল না। বিশেষতঃ বল-প্রয়োগ দ্বারা সমাজ শাসন করিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এ সম্বন্ধেও স্পেনসার সাহেব একটি প্রমাণ দিয়াছেন।

"The failure of Cromwell, permanently to establish a new social condition, and the rapid revival of suppressed institutions and practices after his death, show how powerless is a monarch to change the type of the society, which he governs. He may retard, he may disturb, or he may aid the natural process of organisation, but the general course of his process is beyond his control."

'সামাজিক একটা নূতন নিয়ম স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে ক্রমওয়েলের অকৃত-কার্য্যতা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রতি-নিবৃত্ত নিয়মাবলী ও ব্যবহার-পদ্ধতির পুনরনুষ্ঠান দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, রাজা তাঁহার অধীনস্থ সমাজের প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। তিনি বাধা দিতে পারেন, উৎ-পীড়ন করিতে পারেন, অথবা সমাজ-নিয়মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু সেই স্বাভাবিক নিয়মের সাধারণ গতি তাঁহার শাসনের বাহিরে।'

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাসন করিতেন না। সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী উদার-চরিত্র ব্রাহ্মণ-ঋষিগণের বাক্যকেই সামাজিক ব্যক্তিরা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া শাসন-বাক্যের ন্যায় মানিয়া লইতেন; তবে একটা কথা এই যে, রাজা সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য ব্রাহ্মণগণের যুক্তি-যুক্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, বহু বহু বার রাজ-নীতিকবিপ্লবের ফলে, বর্ত্তমানে আর্য্যজাতির সাধারণ ব্যবহার-পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি দোষ দাঁড়াইয়াছে যে, এ কালের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইতেছে না; কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বা গোড়ামী বলা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিবার মত আছে, তুমি হয়ত তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে হীনশ্রেণীস্থ জাতি-গণকে অপেক্ষাকৃত অধিক সামাজিক অধিকার প্রদান করিবার কথা বলিবে।

যোগ। আজ্ঞা হাঁ।

দয়া। তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু সে অধিকার যথেচ্ছ প্রয়োগ না করিয়া, কোন মহদুদ্দেশ্যে—পবিত্র ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। হীনশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভাবাপন্ন, তাহাদিগকে দেব-কার্য্যে সমধিক অধিকার প্রদান করা মন্দ নহে। অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবগৃহে প্রবেশ, দেব-সেবার্থ পত্র, পুষ্প, বারিত কুশের আহরণ, অতিথি-সেবার আয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে অধিকার প্রদান করিলে, তাহাদিগের উন্নতি হয় এবং সমাজ-শক্তি সমধিক পরিপুষ্ট হইতে পারে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহা অনুমান করা যায়।

যোগ। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণের কার্য্য-প্রণালী দেখিলে এ প্রকার অনুমান করা যায় না।

দয়া। বর্ত্তমানে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহা শিক্ষা ও সংসর্গের ফল। তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যোগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সংসর্গ অধিক কাল হইতে বিস্তার লাভ করে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বের ইতিহাসও যতটা জানা যায়, তাহাতেও দোষ ছিল।

দয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সংসর্গ অধিক কাল হইতে বিস্তার লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু বিজাতীয় সংসর্গ, বিজাতীয় শিক্ষা, বিজাতীয় ভাব-লাভ ভারতের ভাগ্যে বহুদিন পূর্ব্ব

হইতে সংঘটিত হইয়াছিল। তুমি কি মনে করিতে পার না যে, ১১৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার সূত্রপাত হইয়াছে। *

যোগ। পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণেরা কি প্রকার মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঐ প্রকার অর্দ্ধ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এখন কি আমরা জানিতে পারি না ?

দয়া। শুন, আমি সংক্ষেপে কিছু বিবৃতি করিতেছি। মানব-সমাজ যখন আপন আপন গুণানুসারে পৃথক পৃথক কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল ; তখন এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি-শূন্য হইতে লাগিল ; যে হেতু গুণ-সমূহ পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ বিরোধী ভাব-বিশিষ্ট, সেই হেতু গুণগত কর্ম্মী সকলেও পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ বিরোধী ভাব-সম্পন্ন। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী ভাব-সমূহের মধ্যে সম্মিলন বা সহানুভূতি সম্ভব হয় না। সুতরাং জাতিতে জাতিতে সহানুভূতি-শূন্যতা সংঘটিত হইতে থাকিল। প্রত্যুত, মানবের বিবিধ প্রয়োজন-সাধনের জন্য, বিভিন্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মিগণের সাহায্য বিভিন্ন শ্রেণীতে পাওয়া একান্ত আবশ্যক। সমাজের এই অসামঞ্জস্য অবস্থা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণেরাই চেষ্টা করিলেন, এবং কৃত-কার্য্য হইলেন।

---

* ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ভারতে বিরাট রাজ্য সংস্থাপন করেন। পরে মুসলমানেরাই এই দেশের একছত্রাধিপতি রাজা হইয়াছিলেন।

ঋষি উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণেরা, শারীরিক সুখ-ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সমাজের—দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় সমাহিত হইলেন। নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে পর্ণ-কুটীর দ্বারা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় দিবা রাত্রি সেই এক চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। দীর্ঘকাল গভীর গবেষণার ফলে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সমস্ত মানব জাতি বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের দ্বারা চরিত্র বা ব্যবহার-গত পার্থক্য-প্রযুক্ত পরস্পর যে পৃথক ও সহানুভূতি-শূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা-দিগকে কোন এক সার্ব্বজনীন লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করিতে পারিলে, পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত করা যাইতে পারে। ঐ "লক্ষ্য" আর কিছুই নহে—"ধর্ম্ম"। ঐ "ধর্ম্ম" কি, তাহা কেমন করিয়া সাধন করিতে হয়, ইত্যাদি বিদিত হইবার মত যাবতীয় জ্ঞান,—যাহা তাঁহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা বিদিত হইয়াছিলেন; তাহাকে "বেদ" আখ্যা প্রদান করিয়া, অক্লান্ত ত্যাগ স্বীকার সহকারে মানবকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মানুষে যখন তাহার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার শুভময় ফলে সামাজিক শ্রেণীগত অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইতে লাগিল। ফলে এই দাঁড়াইল যে, সত্বরজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা (ক্ষত্রিয়) রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া, নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলের দ্বারা অর্থান্বেষী বিদেশগামী নিরীহ-স্বভাব দুর্ব্বল-দেহ রজস্তমঃ-গুণ-প্রধান বৈশ্যদিগকে, তমোগুণ-প্রধান লোভী, অত্যাচারী, দস্যু তস্করগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে

লাগিলেন। বৈশ্যেরাও আপনাদিগের যথেচ্ছ বিচরণে সাহায্য পাইয়া, উপার্জ্জিত অর্থ অথবা সামগ্রী-নিচয়ের অংশ দিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রয়োজন পূরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্ষুদ্র-চেতা বুদ্ধিহীন কর্ম্মাক্ষম শূদ্রেরা রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়া, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়গণের পদানত হইয়া পড়িল ও তাহা-দিগের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আপন আপন জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিল। অধিকন্তু উচ্চ সংসর্গের ফলে শূদ্রগণের কলুষিত চরিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ায়, সমস্ত বর্ণের মধ্যে এক অভিনব সখ্যতার সৃষ্টি হইল। দূরদর্শী ঋষিগণ আপনাদিগের চেষ্টার সফলতা দর্শন করিয়া, অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সার্ব্বজনীন লক্ষ্য "ধর্ম্ম"কে দৃঢ়ীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মের সাধন-প্রণালী-সমূহকে বিধি-বদ্ধ করিয়া আশ্রম-ধর্ম্ম অভিধা প্রদান করতঃ, সমস্ত শ্রেণীকে আপন আপন মঙ্গলের জন্য তাহার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিলেন। তখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, ঋষি-গণের অসাধারণ আবিষ্কারক শক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ, অযাচিত পরোপচিকীর্ষা দর্শন করিয়া, এবং তাঁহা-দিগের অনুগ্রহে অপ্রত্যাশিত মঙ্গল-লাভে সমর্থ হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে আনুগত্য স্বীকার করিয়া অবিচারিত ভাবে তাঁহাদিগের উপদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই অবস্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল—সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইল। এইটি সমাজের বাল্যকাল।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত সমাজে ভাল মন্দ উভয়-বিধ জ্ঞান-

চর্চ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, মানুষ যেমন যৌবনের প্রারম্ভে স্বভাব-সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ করে, আর্য্য-সমাজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। কেহ বল-দর্পিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইল, কেহ দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত কূট বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া কুকার্য্য সাধন করিতে লাগিল; তাহার ফলে, সমাজ-ক্ষেত্রে অলক্ষিত ভাবে কণ্টক-বৃক্ষের উদ্গম হইল। সমাজের সেই অনিষ্ট-জনক অবস্থা, সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তাঁহারা সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলেন, এবং আন্তরিক বেদনা অনুভব করিলেন। এবার ঋষিগণ সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং দর্শন, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক প্রচার করিয়া, লোক-সমাজকে ধর্ম্ম-পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। অপর দিকে অস্ত্র-বিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা, পৌর্ত্ত, স্থাপত্য বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া, অস্ত্র-বিদ্যা ক্ষত্রিয়কে, পৌর্ত্ত ও স্থাপত্য বিদ্যা বৈশ্যকে দিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বিদ্যা নিজেদের হাতে রাখিয়া অনুশীলন দ্বারা সমাজের মহোপকার সাধন করিতে লাগিলেন। স্থূল-বুদ্ধি অস্থির-চেতা শূদ্রগণ, ইহার কোন অংশ-গ্রহণের যোগ্যতা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ দাস-বৃত্তিতে অনুরক্ত রহিল।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত আবার সমাজের ভাগ্যে পূর্ব্ববৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি শক্তিশালী স্বার্থবান্-গণ, স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে সমাজ-ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা

উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং তাহারই ফলে এবার রাজায় প্রজায়, জাতিতে জাতিতে, আর্য্যে অনার্য্যে, ধর্ম্মে কর্ম্মে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া উঠিল। শারীরিক শক্তিহীন ঋষিগণ এবার অনন্যোপায় হইয়া প্রবলতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ-পূর্ব্বক ঐশী শক্তিকে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। ঋষিগণের চেষ্টা সফল হইল। পরম পিতা শ্রীভগবান লোক-সমাজের মঙ্গলরক্ষার্থে অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল-গণকে নিবৃত্ত করিয়া, আর্য্য-অনার্য্যের মহা সম্মিলনে এক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাপনের প্রয়াস পাইলেন, এবং জীমূত মন্দ্রে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া গাহিলেন ;——

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভারতে,
আপনি সৃজিব আমি সাধুরে রক্ষিতে ॥

কিন্তু এবার প্রয়োজনানুরূপ ফল প্রদর্শিত হইল না। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মবাদের প্রচার হইল—স্বার্থ-শূন্য পরার্থপর কর্ম্মের মহামন্ত্র প্রচার হইল মাত্র।

কিছুকাল পরে আবার শ্রীভগবান আবির্ভাব হইলেন, আবার গাহিলেন ;—

"হিংসা-শূন্য হও জীব দয়া-ধর্ম্ম-রত।
শত্রু মিত্র সবে দেখ আপনার মত॥"

এবার ভারতে জ্ঞান-বাদের প্রচার হইল। ভারতের ভাগ্যে কিছুদিনের জন্য নির্ব্বিরোধ-শান্তি সংস্থাপিত হইল। কিন্তু, হীন-ভাগ্য ভারতের ভাগ্যে সে সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

ভারতের বল-দর্পিত ক্ষাত্র্য-শক্তি, তরবারির সাহায্যে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ধর্ম্মাৰ্জ্জনের দোহাই দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অযথা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-পরায়ণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে উৎসাদন করতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম-বাদের বিনিময়ে কর্ম্মহীনতা প্রচার করিতে লাগিলেন।

"বুদ্ধ"-প্রচারিত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য প্রচার হইল না। কর্ম্ম-হীন জ্ঞান-বাদের প্রচার হইয়া দেশকে ধ্বংস-মুখে অগ্রবর্ত্তী করিতে লাগিল। আবার ব্রাহ্মণগণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, আবার শ্রীভগবান আবির্ভূত হইলেন, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মকে দৃঢ়ীভূত করণাভিপ্রায়ে আবার গাহিলেন ;—

অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম সর্ব্ব জীবে স্থিত।
"যজ্ঞ"* কর্ম্মে কর তায় নিরন্তর প্রীত॥

আবার,—আবার ভারতভাগ্যে তামসা নিশি ও ঘন-ঘটা-রাশি যুগপৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া আর্য্য-সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যুক্ত হইল। বিপরীত আচার-সম্পন্ন বিদেশাগত বিধর্ম্মি-গণের বল-দর্পিত পদাঘাতে ভারত ও ভারতীয় আর্য্য-সমাজের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বল-পরীক্ষায় পরাজিত আর্য্য-জাতির স্বার্থান্বেষিগণ দেশ-ধর্ম্মের কথা বিস্মৃত হইয়া, দলে দলে জেতৃ-গণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-প্রাণ নিরীহ সজ্জনগণ ভোগ-লিপ্সা পরিহারপূর্ব্বক আজীবন দেশ-ধর্ম্মের সেবা করিয়া ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুল-কণায় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাদিগের মঙ্গল কামনায় তাঁহারা আত্মোৎসর্গ

* "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ কর্ম্ম নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

করিয়াছিলেন, আজ সেই অকৃতজ্ঞগণ, বিধর্ম্মির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের তুষ্টি সাধনের জন্য ধর্ম্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণগণকে অবহেলা করিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ভিক্ষান্নেও বঞ্চিত করিতে লাগিল। এইবার পেটের দায়ে ব্রাহ্মণগণ দেশ-সেবা-ব্রতের—ধর্ম্মাচরণের সরল পন্থা পরিহার পূর্ব্বক কূট পন্থার আবিষ্কার করিলেন। পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে শাস্ত্রের বিভিন্ন অর্থ গ্রন্থিত হইতে লাগিল। সমস্ত দর্শনের মধ্যে ন্যায় দর্শন মস্তকোত্তলন করিল; যাজকগণ বৈষয়িক হইয়া অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। "ধর্ম্ম" কর্ম্ম-হীন ভক্তি-শূন্য তর্ক-শাস্ত্রে পর্য্যবসিত হইল। সমাজ প্রাণহীন জড়ের ন্যায় আকার ধারণ করিল।

আবার এক ব্রাহ্মণ-নন্দনের* প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া ঐশী-শক্তিকে আকর্ষণ করিতে সমাহিত হইলেন। আবার গোলকবিহারী বৃন্দাবন-চন্দ্র ভারত-ভাগ্যের তমসাবৃত-গগনে শরৎ-সুধাকরের সহস্র কিরণ-লেখা বিকীরণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বিপদ-বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া নবীন-নাবিক নূতন তরণী লইয়া ডাকিলেন।

বলিলেন, ——আর ঘুমায়ে থেক'না
জাগ, দেখ ঐ উষার আলোকে,—
নবীন জীবনে নবীন উৎসাহে
হও অগ্রসর নবীন পুলকে

---

* শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য।

তরুণ তরণী নবীন নাবিক
নূতন আরোহী নূতন সব।
পুরাতন ফেলে ছুটে এস আগে,
জাগায়ে জীবনে নূতন ভাব।

অসংখ্য পাপীর অনন্ত ভার
বহিবারে ঐ আমার তরা,
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অভিমান
বিন্দু মাত্র কিন্তু বহিতে নারি।

রেখে এস দূরে,— ধনী কিংবা দীন
বিনা মূল্যে পার করিব সবায়,
দয়া, মৈত্রী, জীবে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা,
হরে কৃষ্ণ নাম পারের সহায়।
গাও হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
নিশি কিংবা দিনে যে ভাবে থাক,
পাপ তাপ জ্বালা সব দূরে যাবে,
হরে কৃষ্ণ হরে বলিয়া ডাক।

হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম নাম
গাও সবে জীব দুবাহু তুলে,
পাপী ভাল বাসি, তাই আসিয়াছি
পাপীরে তুলিয়া লইতে কোলে।
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিনারী নরে
ডাকিছেন ঐ "চৈতন্য" আমার
চেতন হইয়া গাও হরে কৃষ্ণ,
শান্তি ধাম ঐ সম্মুখে তোমার ॥

আবার ভারতের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, আবার ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত পরম উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ছত্রচ্ছায়া-তলে দাঁড়াইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মহা সম্মিলনে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল, সমাজ-শক্তি অটল পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় হইবার সূচনা হইল ; কিন্তু—পাঁচটি শতাব্দী পূর্ণ হইতে না হইতে—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমাজাঙ্গ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য পূর্ণ হইতে না হইতেই দুর্ভাগ্য আমরা সে সুযোগ হারাইতে বসিয়াছি। আমরা লক্ষ্য-হীন উদ্ভ্রান্তের ন্যায় যথেচ্ছা ব্যবহারে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ও মৌলিকতা নষ্ট করিতেছি।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ যে, যাঁহারা যুগান্তর কাল ধরিয়া শতবার ভারতের হাসি-কান্নার ভিতরে আপনাদিগের অমানুষিক ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া, অকাতর স্বার্থ-ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অলৌকিক প্রতিভা সহকারে দেশ-ধর্ম্মের সেবা-ব্রতে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন, আধুনিক ইতিহাস তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া কি ঘোর প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতেছেন। দূর হউক সে অজ্ঞের ইতিহাস,—দূর হউক সে বালকের বাচালতা ; এখন প্রকৃত কথা চিন্তা কর।

যোগজীবন! এখনও সমাজের ধ্বংসশীল বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয় নাই। যাহার শেষ অষ্টম ভাগে সমাজ ও ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া পুনর্গঠিত হইবে, সেই কলিযুগের সবে মাত্র প্রথম অষ্টম ভাগ পরিচালিত হইতেছে। এখনই আমাদিগের নাবিক-হীন তরঙ্গাহত তরণীর ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইলে চলিবে না। আমাদিগকে বদ্ধ-পরিকর হইয়া দৃঢ়তা সহকারে প্রকৃত পন্থা

অবলম্বন করিতে হইবে। আবার আমাদিগের আর্য্য-কর্ম্ম-কীর্ত্তি-কাহিনীর গৌরবময় পতাকা হস্তে লইয়া পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

দয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। যোগজীবন চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঠাকুর এত নূতন কথা কোথায় পাইলেন!

সপ্তম অধ্যায়।

পন্থা।

—০—

অন্ধ আমি পথ হারা
পড়েছি (তোমার) চরণ-তলে।
কিছুই দেখি না নাথ
কোথা পথ দাও ব'লে।

পঙ্কিল-সলিল-স্রোতে লক্ষ্য-ভ্রষ্টে ভেসে যেতে
আর তুমি দিও না গো,
হাত ধ'রে নাও তুলে।

হতাশ ভগ্ন হৃদয়ে আছি তব আশা চেয়ে,
অন্ধে পথ দেখাইতে
জ্ঞান-বাতি দাও জ্বেলে।*

দয়ানন্দের গানটী সমাপ্ত হইলে যোগজীবন কহিলেন,—আপনার লোক-হিতকর উপদেশগুলি শুনিতে শুনিতে শুনিবার বাসনা আরও বলবতী হইতেছে, তাই আপনাকে পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিতেছি। যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু কি উপায়ে উক্ত প্রকার গুণ-সম্মিলনে কর্ম্ম-পদ্ধতি গঠন করা

---

* পূরবী-একতালা।

যায় এবং কি প্রকারেই বা উহা বিশৃঙ্খল সমাজে বিস্তার করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

দয়া। দেশের জন্য কিছু করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করিতে হইবে।

"'Unselfishness is more paying" 'নিঃস্বার্থতা স্বার্থপরতা অপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।"

ইহা নীতি-শাস্ত্রের শূন্য-গর্ভ বাক্য নহে। ইহার মধ্যে আত্মোন্নতিকর মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক নিঃস্বার্থতা ও কর্ম্ম-পদ্ধতি শিখিতে হইবে ও প্রচার করিতে হইবে।

যোগ। ভারতে কোন বিষয় প্রচার করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

দয়া। সত্য বলিয়াছ। অধঃপতিত দেশ কোন ভাল কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষ কথা এই যে, এখানে যাহার একটু কিছু করিবার মত ক্ষমতা জন্মিল, তিনিই একটা নূতন কিছু প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভে যত্নবান্ হইলেন। ইহারই ফলে এ দেশে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়া দেশকে ভয়ানক বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"ভারতে হইল যবে বেদের সৃজন
ভাঙ্গে নাই রোমানের গর্ভস্থ স্বপন।"

পৃথিবীর আদিম ও অত্যন্ত উন্নতিশীল আর্য্যজাতির বাসভূমি ভারতবর্ষে নূতন কিছু প্রচার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য

ব্যাপার। তুমি আমিত' দূরের কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, যাঁহাদিগকে আমরা ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া থাকি, তাঁহারাও নূতন কিছু বলেন নাই। সুতরাং দেশকে পুরাতন ভাবের পুরাতন কর্ম্ম-পদ্ধতির দ্বারা সংস্কার করিতে হইবে। যদিও কষ্ট-সাধ্য, তবুও যত্ন সহকারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া উহাই করিতে হইবে; কঠিন কার্য্যই করিবার উপযুক্ত।

পাশ্চাত্য মনস্বী ব্লাকী (Blackey) বলিয়াছেন, "Difficult things are only things worth doing and they are done by a determined will and a strong hand."

'কঠিন কার্য্যই কর্ত্তব্যের উপযোগী, এবং তাহা সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও নিপুণ হস্তের দ্বারা সম্পাদিত হয়।'

যে দেশের শিক্ষাগারে জাতীয়-জীবন গঠনোপযোগী জাতীয়-ধর্ম্ম ও জাতীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই, সে দেশে স্বার্থ ও সুখ বিসর্জ্জন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রচার করিতে হইবে। মুদ্রা-যন্ত্রের অনুকম্পায় প্রচার কার্য্য আজকাল একটু সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পত্রিকাকারে এবং পুস্তকাকারে উপদেশ-যোগ্য বিষয়গুলি মুদ্রিত করিয়া যথাসম্ভব অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। সম্ভব হইলে বিতরণ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

যোগ। আজ কালকার দিনে নাটক নভেল ও বাজে পুস্তক পড়িবার দিকে লোকের স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকেরই এ জাতীয় পুস্তকাদি কিনিতে পয়সা—পড়িতে সময় জুঠে না। কেহ কেহ আবার পড়িয়া, পুরাতন গদ্য আজ কালকার দিনে রুচিকর নহে বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

দয়া। অবশ্য নাটক নভেলাদি যদি ভাল লোকের লেখা হয়, তবে তাহার মধ্যেও শিখিবার বিষয় থাকিতে পারে। আজকাল একটু একটু বাতাস ফিরিতেছে। কেহ কেহ যত্ন-পূর্ব্বক এ সব বিষয়ও আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে কালে কালে ভারতে পুনরায় পুরাতন ভাব প্রতিষ্ঠাপনের আশা করা যাইতে পারে।

কোনও একটী বিষয় একজন একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজ মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ক্রমে যখন দেশের সহস্র সহস্র লোকের ঐ একজাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে, যখন দেশের সহস্র সহস্র লোক নিঃস্বার্থভাবে দেশ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে, তখন করুণা-নিদান ভগবান কোনও এক সাধন-সিদ্ধ সমর্থবান দেহে ঐশী শক্তির সঞ্চার করিয়া, তাঁহার দ্বারা দেশকে জাগাইয়া তুলেন; এবং আমরা তখন তাঁহাকেই অবতার বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতে প্রয়াস পাই। সে যাহা হউক, কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া কথিত প্রকার গুণ-সম্মিলনে শক্তিময় কর্ম্ম-জীবন গঠিত হইতে পারে, তাহা শুন। দৈহিক ও মানসিক বলের সামঞ্জস্য সংরক্ষণপূর্ব্বক কর্ম্ম-জীবন গঠিত না হইলে, কোনও শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এমন একটী সহজ উপায় অবলম্বন করিতে

হইবে যে, যাহার দ্বারা পূর্ব্ব-কথিত প্রকারের সাত্বিক এবং রাজসিক গুণ-সম্মিলনে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক পুরা ভারতের আদর্শে সমাজস্থ নরনারীগণের কর্ম্ম-জীবন গঠিত হইতে পারে।

যোগ। সে সহজ উপায় কি?

দয়া। "ব্রহ্মচর্য্যা". কিন্তু উহা ঋষিগণের উপদেশ মতে অনুষ্ঠিত না হইলে কার্য্যকরী হইবে না।

যোগ। কাল পরিবর্ত্তনের সহিত কর্ম্ম-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে কি?

দয়া। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কাল দেশ ও পাত্রের অবস্থানুসারে কর্ম্ম-পদ্ধতির দুই একটী প্রত্যঙ্গ পরিহার বা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে মাত্র।
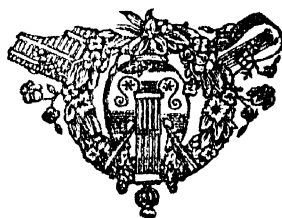
অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য।

পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিত সোপানাসনে সমাসীন দয়ানন্দের সম্মুখে উপবিষ্ট যোগ জীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রহ্মচর্য্যা" কি তাহা বিশেষ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

দয়ানন্দ কহিলেন,—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগের ছাঁচ উল্টাইয়া গিয়াছে; তাই ব্রহ্মচারীর দেশে আজ ব্রহ্মচর্য্যা কি, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম-চর্য্যা কি, তাহা আমি যথাসাধ্য বিবৃতি করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মের ন্যায় নির্লিপ্ত, শুদ্ধ-সত্বাত্মক ভাব-বিশিষ্ট আচরণ করাকেই ব্রহ্মচর্য্যা কহে। "চর্" ধাতু "য" করিয়া "চর্য্য" এবং "চর্য্য" "আ" করিয়া চর্য্যা শব্দ সাধিত হইয়াছে; সাধারণ অর্থ আচরণ করা, অনুষ্ঠান করা, ব্যবহার করা, চরিত্র, নিয়ম, গমন ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যার অর্থ—ব্রহ্ম-আচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় পরম পবিত্র নিষ্কাম, নির্লোভ, নিস্পৃহ আচরণ করা। শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

"ব্রহ্মচর্য্যা তপোত্তমং"

'ব্রহ্ম-চর্য্যাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।' মনুষ্যত্ব-শক্তির বিকাশ-করিতে—আপনাকে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রবর্ত্তী করিতে যে

সমস্ত চেষ্টা করিতে হয়, তাহাকেই তপস্যা কহে। জগৎকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া সম্যক প্রকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করাই মানুষের চরম লক্ষ্য। তাহার জন্য মানব যে নানাবিধ ক্লেশকর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকেই তপস্যা—তাহাকেই সাধনা কহে। এই তপস্যা বা সাধনার জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্ম-চর্য্যা রূপ মহাব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র কর্ত্তারা বলিয়াছেন,—

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"

'বীর্য্য ধারণকেই ব্রহ্মচর্য্যা কহে।' বীর্য্য শব্দের আভি-ধানিক অর্থ বীজ, দীপ্তি, তেজ, বল, শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, শুক্র বা চরম ধাতু প্রভৃতি অনেক বুঝায়। এখন বুঝিয়া দেখ, এই বীর্য্যের অপচয় হইলে মানবের উন্নতি-জনক শক্তি হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করে; তাই শাস্ত্র কর্ত্তাগণ বীর্য্যধারণকেই ব্রহ্মচর্য্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা উহাকে স্পষ্ট রূপে বুঝিবার জন্য আপাততঃ বীর্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি, সঞ্চয় ও অপচয়ের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উন্নতির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে এবং কর্ম্ম করিবার জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য, শক্তি ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধ-স্বভাব অত্যন্ত আবশ্যক। তাই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

'সুস্থ শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের মূল ভিত্তি।'

কর্ম্ম করা আবশ্যক না থাকিলে দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয় হইত না। কর্ম্ম আবশ্যক, কর্ম্মের দ্বারাই মানুষের আনন্দ এবং

উন্নতি প্রস্ফুট হয় বলিয়াই মানব দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ ও সবল অর্থাৎ কর্ম্মক্ষম রাখিবার জন্য নানাবিধ পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া রসাদি ক্রমে ষষ্ঠ ধাতু এবং তাহা হইতে শরীরের সার ও জীবনের আশ্রয় স্বরূপ বীর্য্য উৎপন্ন হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"রসাদ্বৈ শোণিতং জাতং শোণিতান্মাংসসম্ভবঃ।
মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থিসমুদ্ভবঃ।
অস্থ্নো মজ্জা সমভবৎ মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ।"

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক অন্তে রস রূপে পরিণত হয়। সেই রসের সারাংশ হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে চরম ধাতু শুক্র উৎপন্ন হয়। এই শুক্রকেই বীর্য্য বলা হয়। রস রক্তাদি ধাতুসমূহের সারাংশ বীর্য্য, একথা পাশ্চাত্য শারীর-বিধানবিৎ ডাক্তারগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। ডাক্তার Luis (লুইস) বলিয়াছেন,—

"All eminent Physiologists agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the semen.

সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, শোণিতের সারাংশই বীর্য্যরূপে পরিণত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ এই শুক্র বা বীর্য্যের গুণবর্ণন-কালে বলিয়াছেন।

"শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতং
গর্ভবীজং বপুঃসারং জীবনাশ্রয় উত্তমঃ।"

'শুক্র সোম-গুণাত্মক, শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলকর, পুষ্টিকর, গর্ভোৎপাদক বীজ, শরীরের সারাংশ এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।'

জীবনের দ্বারা কোন উত্তম কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, জীবনাশ্রয় বীর্য্যকে বাল্যকাল হইতে অচঞ্চল ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। তাহাই ব্রহ্মচর্য্য—তাহাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, এবং তাহাই আত্মোন্নতির মূল শক্তি।

যোগ। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিলে কার্য্যতঃ মন ও শরীর কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

দয়া। শুন, ব্রহ্মচর্য্যাকে সাধারণতঃ বীর্য্য-ধারণ বলিয়াই বিবৃতি করা হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বীর্য্যকে চরম ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ধা'' ধাতু হইতে ধাতু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ধা" ধাতুর অর্থ ধারণ, পোষণ ইত্যাদি। যাহা শরীরকে পোষণ করে বা রক্ষা করে, তাহাকে শারীর-বিধান মতে ধাতু কহে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত, কফ এক শ্রেণীর ধাতু; এবং রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও এই সকলের সারভাগ—শুক্র অপর শ্রেণীস্থ ধাতু। ইহারা সকলেই মানব শরীরকে রক্ষা করিতেছে। ইহাদের কোন একটীর অভাবে মানব দেহ অকর্ম্মণ্য হইতে পারে।

বীর্য্য অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইলেও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করতঃ মানব দেহের জীবনী শক্তিকে রক্ষা করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

"যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥"

'ঘৃত যেমন দুগ্ধের এবং গুড় যেমন ইক্ষু-রসের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, বীর্য্যও তেমনি মানব দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তবে ;—মস্তিষ্ক উহার কেন্দ্রস্থল।

স্ত্রী-সংসর্গাদি বৈধ ও অন্য যে কোন অবৈধ উপায়ে শরীর হইতে বীর্য্য নিষ্কাষণ করিলেই, সমস্ত শরীর—বিশেষতঃ মস্তিষ্কের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত করে। এই দুর্ব্বলতার ফলে মানব দেহে সর্দ্দি-কাশি হইতে মূর্চ্ছা-উন্মাদ প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ও দুরারোগ্য রোগ সমূহ উৎপাদিত হইয়া মানুষকে জীবন্তে মৃত প্রায় করিয়া তুলে। মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বীর্য্য-হীনতাই বহু ব্যাধির নিদান তত্ত্ব। অর্শ, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, বাতব্যাধি, দাহ, মূর্চ্ছা প্রমেহ, বহুমূত্র, তৃষ্ণা, স্বর-ভেদ, কাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি বহু বহু রোগউৎপাদনের অন্যান্য কারণ থাকিলেও শুক্রহীনতাই উহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ। শুক্রহীনতা কেবল শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিয়া ক্ষান্ত হয় না : মনের উপরেও প্রবল অত্যাচার করে।

অত্যধিক স্ত্রী-সংসর্গ, অথবা অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্র-ক্ষয়ের পরিণাম ফলে মানবকে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে আনয়ন করে যে, সমস্ত জাবনকে ঘোর অনুতাপানলে বিদগ্ধ করিতে থাকে। অত্যধিক বীর্য্য-ক্ষয়ের ফলে বীর্য্যকোষের স্নায়ু-কেন্দ্র এত শিথিল হইয়া পড়ে যে, সামান্য মাত্র উত্তেজনা

হইলে, অথবা অল্প মাত্র বেগ দিলে, আপনা আপনি বীর্য্য স্খলিত হইতে থাকে। মন সর্ব্বদাই কুচিন্তায় নিরত হয়। পরিশেষে নিদ্রিতাবস্থায়ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, এবং জাগ্রত অবস্থায়ও প্রস্রাবের সহিত শুক্র নিঃসারিত হয়। ইহাতে শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অক্ষুধা, তৃষ্ণা, অরুচি, শরীরের নানাস্থানে—বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও স্কন্ধদেশে পীড়কা, (ছোট ছোট ফোড়া) কেশের অল্পতা, স্বরের কর্কশতা, মেরুদণ্ডে ও অস্থি-সন্ধিতে বেদনা, মাংস-পেশীর কোমলতা, শরীরের বিশেষতঃ—ললাট চর্ম্মের শিথিলতা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা, আলস্য, তন্দ্রা, দর্শন, শ্রবণ ও স্মৃতি-শক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া মানুষকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। তখন হৃদয়ের সমস্ত আশা, ভরসা, উদ্যম, উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি গুণগুলি কোথায় চলিয়া যায় ; হতাশায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠে, আপনাকে পৃথিবীর ভারস্বরূপ বোধ হয় এবং মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে।

'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'

এই মহাবাক্যের দ্বারা "শিব সংহিতা" ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মনীষিগণও ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। যথা,—

"Chastity is life, sensuality is death"

পাশ্চাত্য মনস্বী ডাক্তার নিকল্‌স্‌ এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ;———

"It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and difused through his system, makes him manly strong, brave heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered musculer movement, a wretched nervous system epilepsy, insanity and death"

চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শারীর-বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও নিয়ত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি রক্তের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়া, শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্যমশীল এবং বীর্য্যশালী করে; আর এই বস্তুর অপব্যয়ে মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং

চঞ্চল মতি করিয়া ফেলে। তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীর-যন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যয় হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংস-পেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র হীন-শক্তি হইয়া যায় ; মূর্চ্ছা, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বল, মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে ?

ব্রহ্মচর্য্য-সুরক্ষিত ব্যক্তির জীবনে আয়ু, আরোগ্য, যশ এবং শান্তি প্রভৃতি অনন্ত সুফল প্রদান করে। ব্রহ্মচর্য্যা হইতেই মনুষ্যত্ব বিকাশোপযোগী শক্তি-সঞ্চয় হয়।

ব্রহ্মচর্য্যা রূপ অনলের প্রবল শিখায় মানব-হৃদয়ের কুবৃত্তি গুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়, চিত্ত অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত প্রশান্ত ভাব এবং মুখমণ্ডল পবিত্র কান্তিযুক্ত স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। ইন্দ্রিয়গণ শক্তিশালী এবং কর্ম্মঠ হয়। স্বাত্বিক ভাব বিশিষ্ট প্রকাশ-শীল সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিকাশোপযোগী মস্তিষ্ক এবং প্রখর মেধা-শক্তি, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই লাভ হয়।

ডাক্তার নিকল্‌স্‌ এক স্থলে বলিয়াছেন ;—

"The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spritual life"

'জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও মানসিক তেজ, এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়।'

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণের ফলে ব্রহ্মচারীর শরীরে ও মনে এক অমানুষিক দৈব-শক্তির আবির্ভাব হয়। তখন তিনি ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়াও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রণোদিত হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী কর্ম্ম-চেষ্টার দ্বারা আপন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে ধারাবাহিক রূপে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন। ক্রমে তাঁহার সাধন-শক্তি উদ্দীপিত হইয়া প্রজ্ঞা নামক তৃতীয় চক্ষুর বিকাশ করিতে থাকে। তখন তিনি অনধীত শাস্ত্র-তত্ত্বের গভীর রহস্য উদ্ভেদ করিতে এবং নানাবিধ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেও সমর্থ হন। প্রয়োজন সিদ্ধি তাঁহার পক্ষে অনায়াস সুলভ হইয়া উঠে।

ব্রহ্মচারী শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদিতে সহজে অভিভূত হন না। এমন কি যে ব্যাধি দানবের প্রবল উৎ-পীড়নে বঙ্গ দেশের অনেক জনপূর্ণ নগর জনশূন্য কণ্টকারণ্যে পরিণত হইতে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি পাপ ও তাঁহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করে না।

বুঝিয়াছ যোগ জীবন! ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণারক্ষণের ফলাফলই মানবের উন্নতি অবনতি, জীবন ও মরণের অনিবার্য্য কারণ। চল অদ্য আশ্রমে যাই বলিয়া দয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন।
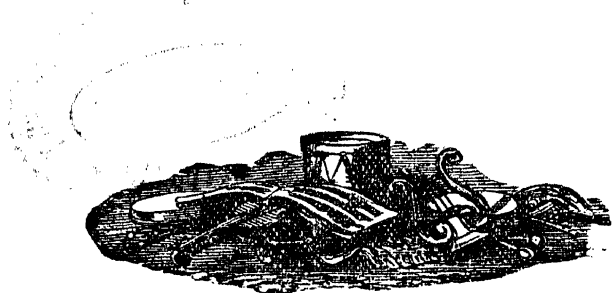
নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ।

গঙ্গাতীরোপবিষ্ট দয়ানন্দের চিন্তাপ্রবাহ ভঙ্গ করিয়া যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সত্বাদি গুণের উত্তেজনা-প্রণোদিত হইয়া মানব সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ভাল মন্দ কার্য্য করে। আবার বলিলেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই মানব উন্নত হয় এবং ভাল ভাল কার্য্য করিতে পারে। গুণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

দয়ানন্দ বলিলেন শুন, ব্রহ্মচর্য্যের ফলে গুণ সমূহের ক্রমোত্তম অর্থাৎ তমো হইতে রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্বগুণ ও তত্তৎ গুণোচিত ভাব গুলি প্রস্ফুটিত হয়।

বুদ্ধিই কর্ম্মকরী ইন্দ্রিয়গণের মৌলিক শক্তি; কারণ বুদ্ধির সাহায্যেই দর্শন, শ্রবণ, গমন, চিন্তা ও আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদিত হয়। বুদ্ধির প্রভাবেই জগৎরাজ্যের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় বিষয় মানবের গোচরীভূত হয়। সুতরাং বুদ্ধিকে প্রকৃতি দেবীর সৃষ্টির প্রথম কল্পনাও বলা যাইতে পারে।

সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা কপিল ঋষি এই বুদ্ধি-তত্বকে মহত্তত্ব নামে অভিহিত করিয়া এবং তাহা হইতে জগতের যাবতীয় বিষয়

ক্রম-বিকাশ-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পূরাতন সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহর্ষি কপিল, সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ এই প্রকারে দেখাইয়াছেন যথা ঃ—

"প্রকৃতে র্মহান ততোহহঙ্কার স্তস্মাৎ গণাশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥"

সাংখ্য কারিকা ২২।

মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয় এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ স্থূল-ভূতের উৎপত্তি, এবং এই পঞ্চ স্থূল-ভূত হইতে যাবতীয় জড়, ও জীব-জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গাগত এই দার্শনিক দুরূহ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। আমরা আপাততঃ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করি যে, কার্য্যকরী ইন্দ্রিয়গণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ হয় কি প্রকারে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ (কথা বলিবার যন্ত্র জিহ্বা) পাণি (হস্ত) পাদ, (চরণ) পায়ু (গুহ্য) উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন—এই দশটী ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। (সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছাজনক শক্তিকে মন কহে)

মনের অধিপতি বুদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু মনের মধ্য দিয়া বুদ্ধি-তত্ত্বের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে; কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের নিকট হইতে তৎ

সম্বন্ধীয় বিচার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান আবিষ্কার করিবার মত কোন শক্তি মনের নাই। মন উহা বুদ্ধি তত্ত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বিকাশ করে; পরে প্রয়োজন হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় উহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিকট প্রেরণ করে, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় তখন ঐ জ্ঞানের বিষয়—কর্ম্মকে সম্পাদন করে অথবা ত্যাগ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি মন, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের কৃতকার্য্যের ভাল বা মন্দ ফল কিংবা তৃপ্তি বা বিরক্তি উপভোগ করে মন।

মন অথবা ইন্দ্রিয়গণ, কাহার ও চেতনা নাই, সকলেই জড়, চৈতন্য সত্ত্বাবিশিষ্ট বুদ্ধি আপনার শক্তি মনে সংযোজনা করে বলিয়াই জড় মন চেতনের ন্যায় ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয়; এবং তখন মন আপন শক্তির সহিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযোজিত হয় বলিয়াই জড় ইন্দ্রিয়গণও চেতনের ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, মন যখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযোজিত না থাকিয়া দূরস্থ কোন বিষয়ের ধ্যানে (চিন্তায়) নিমগ্ন রহে, তখন ইন্দ্রিয়গণ জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করে; এমন কি চক্ষুর সম্মুখে কোন বস্তু থাকিলে ও চক্ষু তখন তাহা দেখিতে পায় না; উত্তাপ, শৈত্য লাগিতেছে কিনা চর্ম্ম তাহা অনুভব করিতে পারে না।

এখন দেখা যা'ক যে, বুদ্ধির শক্তি মনের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোজিত হয় কি প্রকারে। মনে কর একটী পুষ্প চক্ষের সম্মুখে পতিত হইল, এবং ঐ পুষ্পের চ্ছায়ার আঘাতে

অক্ষিগোলকের মধ্যস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র কম্পিত ও প্রবাহিত হইয়া মনকে আঘাত করিল, মনও তদ্রূপে কম্পিত ও প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধি কেন্দ্রে আঘাত করিল, এবং তথা হইতে "ভাল" এই জ্ঞানটী সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এখন মনের "ভাল" এই প্রাপ্ত ভাবটী স্নায়ু কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়ারূপে চক্ষুর মধ্য দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইল, সুতরাং চক্ষু তৎক্ষণাৎ তাহাকে সুন্দর দেখিল; কিন্তু যে হেতু মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ রাজা, সেই হেতু এই সুদর্শন জনিত তৃপ্তিটাও উপভোগ করিল মন; চক্ষু জড়ের ন্যায় কেবল পরার্থ অর্থাৎ মনের জন্য কার্য্য সম্পাদন করিল মাত্র। ক্রমে মন হইতে আর একটা অবস্থা প্রকাশ পাইল; এই অবস্থাটী ও মন মস্তিষ্কস্থিত সংস্কার ও স্মরণ-শক্তির কেন্দ্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু এই অবস্থাটী পূর্ব্বোক্ত "ভাল" এই কথাটীর সহজাত বিচার-বুদ্ধি; অর্থাৎ "ভাল" বটে, কিন্তু "কি প্রকারের ভাল" ? এই প্রকারের বিচার বা বিতর্ক কল্পনা মনের বিকল্পাত্মক অংশ হইতে স্বভাবতই উদ্রিক্ত হইয়াছে বলিয়া মন সংস্কারের ভাণ্ডার হইতে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে "সুদর্শন এবং "সুগন্ধ" বিশিষ্ট ভাল" এই বিচার-কৃত মীমাংসা-সূচক ভাবটীও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এখন চক্ষুর দ্বারা দর্শন ক্রিয়া সম্পাদিত হইবা মাত্র সুগন্ধ এই ভাবটী উপভোগ করিবার জন্য মন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার গন্ধ গ্রহণ করিতে উদ্‌ব্যক্ত হইয়া কর ও চরণকে সেই সুদর্শন ও সুগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্পের নিকটে পরিচালন করিতে চেষ্টিত হইল; এবং বিশেষ কোন বিঘ্নের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে চরণ যুগল কর-

দ্বয়ের সহিত সমস্ত শরীরকে পরিচালন করিয়া পুষ্পের নিকটে উপস্থিত করিল। তখন কর, পুষ্পকে চয়ন করতঃ নাসিকার নিকট উপস্থিত করিল এবং মন নাসিকার দ্বারে গন্ধ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ইন্দ্রিয়-গণের সম্পাদনোপযোগী কার্য্যের কারণ, বহির্জগতের চিত্র-চ্ছায়া, কিন্তু কার্য্য সম্পাদনোপযোগী উপায় উদ্ভাবন করে মন। মনের ইচ্ছানুসারে ও মনের আধিপত্যে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সম্পাদিত কার্য্যের ফলাফল, প্রীতি, অপ্রীতিও উপভোগ করে মন।

ইন্দ্রিয়গণ জড়, উহারা মনের প্রেরণায়, মনের আধিপত্যে চেতনের ন্যায় কার্য্য করে। মনও জড়। কারণ যে দুইটী শক্তির একত্র সমবায়ে মনের অস্তিত্ব অনুভব হয়, ঐ সংকল্পাত্মক এবং বিকল্পাত্মক শক্তি দুইটী সম্পূর্ণরূপে বোধ-শক্তির মুখাপেক্ষী; কারণ, গ্রহণ যোগ্য জ্ঞানের দ্বারা মনের সংকল্পাত্মক-শক্তি উত্তে-জিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত করে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

"জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টা জন্যা ভবেৎ ক্রিয়া॥"

'জ্ঞান হইতে চিকীর্ষা অর্থাৎ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে যত্ন (আদর) যত্ন হইতে চেষ্টা, এবং চেষ্টা হইতেই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

জ্ঞানটা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। মন উহা বুদ্ধি তত্ত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। বিচার-শক্তি বিশিষ্ট বুদ্ধি-তত্ত্বই ভাল মন্দাত্মক জ্ঞান উদ্ভাবন করে। যখন বুদ্ধি-তত্ত্ব

"ভাল" সুতরাং "গ্রহণ যোগ্য" এই জ্ঞান মনের নিকট প্রেরণ করে, তখনই মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হয়, আর যখন বুদ্ধিতত্ত্ব "মন্দ", সুতরাং গ্রহণ যোগ্য নহে—ত্যাগ যোগ্য, এই প্রকার জ্ঞানের আবিষ্কার করে এবং মনের নিকট প্রেরণ করে, তখন মন আর কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব মন জড়। সুতরাং কার্য্য করণের প্রকৃত মৌলিক শক্তি বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব বা বোধ-শক্তির দুই প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয় ; অর্থাৎ একটী বস্তু বা বিষয় দর্শন বা মনন করিয়াই ভাল মন্দ বিচারযুক্ত জ্ঞান, অপরটী সংস্কার, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে বিচার দ্বারা মীমাংসা হইয়া স্থিরতররূপে বোধ-শক্তিতে অবস্থান করিতেছে। উক্ত সংস্কারজ যে জ্ঞান, তাহা বিকাশ করিতে স্মৃতি শক্তির আবশ্যক, সুতরাং মস্তিষ্কে বোধ-শক্তির ন্যায় স্মৃতি-শক্তিরও অবস্থান রহিয়াছে। অতব কর্ম্মকরণ ব্যাপারে বোধ-শক্তির ন্যায় স্মৃতি-শক্তিও মৌলিক আবশ্যকীয় বিষয়।

বোধ-শক্তির সহিত গুণসমূহের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কের মধ্য হইতে যে স্নায়ুমণ্ডলী প্রকম্পিত হইয়া বোধ-শক্তির বিকাশ করে, ঐ স্নায়ু সমূহের কতকগুলি সাত্ত্বিক, কতকগুলি রাজসিক, এবং কতকগুলি তামসিক। সেই জন্য বোধ-শক্তিতে গুণভেদ পরিলক্ষিত হয়।

যোগ। তাহা কি প্রকারে বুঝিব ?

দয়া। একই বস্তু বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকারে দেখিতে পায় ; অর্থাৎ একটী পুষ্প দেখিয়া কেহ তাহা দেবতার চরণে অর্পণ করিতে বাসনা করে, অপর কেহ সেই পুষ্পটীকে

কামিনীর কর-কমলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে; আর কেহ বা তাহার আবশ্যক বোধ করে না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রথম ব্যক্তির মস্তিষ্ক সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্ক রাজসিক, তৃতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্ক তামসিক বুদ্ধির বিকাশ করিতেছে।

যোগ। কোন বস্তু দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে মস্তিষ্ক সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রকাশ না করিয়া রাজসিক বুদ্ধি প্রকাশ করে কেন?

দয়া। মস্তিষ্ক-মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ভেদে বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট যে স্নায়ুমণ্ডলী রহিয়াছে, বাহিরের দৃষ্ট বা মনোনীত বস্তুটীতে সাধারণতঃ যে গুণটী প্রবল থাকে, উক্ত দৃষ্ট বা মনোনীত বাহ্য-বস্তুর চিত্র-চ্ছায়া চক্ষু ও মনের মধ্যস্থিত স্নায়ুগুলিতে কম্পন উপস্থিত করিয়া ক্রমে মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যেগুলি সেই গুণসমন্বিত সেই গুলিকেই কম্পন করে। তখন সেই কম্পিত স্নায়ুগুলি ক্রমে মস্তিষ্কস্থিত সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে নিজ কম্পনের অনুরূপভাবে কম্পিত করিয়া, সমস্ত মস্তিষ্ক হইতে বাহিরের চিত্র-চ্ছায়ার অনুরূপ গুণসমন্বিত বোধ-শক্তির বিকাশ করে।

যোগ। মস্তিষ্কের কোন্ অবস্থায় কোন্ গুণ প্রকাশ করে?

দয়া। মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র যদি শান্তভাবে থাকিয়া কর্ম্মশীল হয়, তবে সত্ত্বগুণের বিকাশ অনুভব করা যায়। যদি ঐ স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিতভাবে কর্ম্মশীল হয়, তবে তাহারদ্বারা রজোগুণের বিকাশ বুঝা যায়; আর যখন স্নায়ুসমূহ অত্যধিক উত্তেজনার ফলে উচ্ছৃঙ্খলভাব বিকাশ করে অথবা অন্য কোন কারণে

নিস্তেজ ও কর্ম্মহীন হয়, তখন তামসভাবের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

যোগ। মানবের মস্তিষ্ক অথবা তন্মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্র শান্ত, অশান্ত এবং অবসন্ন প্রভৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে কেন?

দয়া। বিশুদ্ধ বীর্য্যের দ্বারা মস্তিষ্ক প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্কাধার যদি মস্তিষ্কের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তবে সামান্যতঃ কোন কারণ উপস্থিত হইলেও স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া দ্রুত স্পন্দিত হইতে সুযোগ পায় না; এবং তাহারই ফলে সত্বগুণের বিকাশ হইয়া মানবের মনের ভাব ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি শান্তস্বভাব অবলম্বন করে। যদি মস্তিষ্কাধারে মস্তিষ্কের অভাব বা অল্পতা অথবা তরলতা উপস্থিত হয়, তবে কোন স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজক কারণ (কামিনী, কাঞ্চন ইত্যাদি) সমীপস্থ হইলেই মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুমণ্ডলী দ্রুত স্পন্দিত হইতে সুযোগ পায়; কারণ ঘনীভূত কর্দ্দমের মধ্যস্থিত একগাছী রজ্জুর এক অংশে আঘাত করিলে তাহার সমস্ত অংশ কম্পিত হইতে পারে না, ঐ ঘনীভূত কর্দ্দম তাহাতে বাধা প্রদান করে। এইটীকে সাত্বিক অবস্থা বলা যায়। কিন্তু তরল পদার্থের মধ্যস্থিত রজ্জু আহত হইলে তাহার সমস্ত অংশই কম্পিত হইতে পারে। মস্তিষ্কের এই প্রকার অবস্থা রজোগুণ প্রকাশক। আর উক্ত স্নায়ুমণ্ডলী যদি অত্যন্ত উত্তেজিত হইতে হইতে উচ্ছৃঙ্খল হয় অথবা অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে মস্তিষ্ক হইতে তমোগুণ প্রকাশ পায়। স্নায়ুমণ্ডলীর এই প্রকার শান্ত, দ্রুত অথবা অবসন্ন ভাবের কম্পন মনকে প্রতিহত করে বলিয়া মন ও মস্তিষ্কের অবস্থানুসারে শান্ত, চঞ্চল অথবা

অবসাদগ্রস্থভাবে ইন্দ্রিয়গণকে যে প্ররোচিত করে, সেই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আচরিত কার্য্যাবলী সত্ত্বাদি গুণাত্মক অথবা উত্তম, মধ্যম, চরিত্রাত্মক কার্য্য বলিয়া অভিধা প্রাপ্ত হয়। এখন দেখ যে, মস্তিষ্কে যদি সত্ত্ব অথবা সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের অবস্থা উৎপাদন করা আবশ্যক হয়, তবে মস্তিষ্কাধার পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টার জন্য যে যে ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকেই বীর্য্যধারণ বা "ব্রহ্মচর্য্য" বলা যায়।

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী।

যোগ। আর্য্য-ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কাম্য-কর্ম্মে এবং নিত্য-কর্ম্মে যে প্রকার আশ্রমভেদে অধিকার ভেদ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে তদ্রুপ কোন অধিকার ভেদ নির্দ্দেশ আছে নাকি ?

দয়া। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আর্য্যশাস্ত্রে গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস এবং বানপ্রস্থের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যকে ও একটী আশ্রম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ধীর ভাবে আলোচনা করিতে গেলে বুঝা যায় যে, গার্হস্থ্য আশ্রমের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ। পূরাকালে ভারতবর্ষে কথিত প্রকার আশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ছিল, এবং সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি অবস্থা ও সামর্থ্যানুসারে এই চতু-র্বিধ আশ্রম মধ্যে বিভক্ত হইতেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদনান্তর আপন চরিত্রকে সমধিক উন্নীত করিতে সমর্থ হইতেন ; তাঁহারাই বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ সাধনে প্রয়াস পাইতেন। সুতরাং বান প্রস্থাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্যা আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। গার্হস্থ্যজীবনের

জন্যই উহা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, গৃহস্থ মাত্রেই উহা যত্নপূর্ব্বক আচরণ করিবেন, ইহাই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। মানব মাত্রেরই বাল্যকাল হইতে সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্ম-শক্তি উন্মেষ হইতে থাকে। এই কাল হইতেই সমস্ত জীবনের উপভোগ্য স্বাস্থ্য, স্বভাব, ধর্ম্ম, নীতি ও বল সঞ্চয় করিবে। এই বাল্য জীবনে উন্মেষিত কর্ম্ম-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কালে উহা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে এবং আপন সমাজ ও দেশকে কলুষিত করে। বিশেষতঃ—বাল্যকালে অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমল থাকে, এই কালে অল্পমাত্র চেষ্টার দ্বারা স্বভাবকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। সুতরাং আপাত মধুরতা-পূর্ণ কুসংসর্গ-প্রভাব বালকের কোমল অন্তঃকরণকে অত্যল্প আয়াসেই আয়ত্ত করিয়া সারাজীবন বিস্তৃত এক সুবিশাল দুঃখ-সমুদ্রের মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে পারে। কালে দুঃখ-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত অতিক্রম করিয়া স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। তাই ঋষিগণ ধর্ম্মোপদেশ এবং তদনুরূপ কর্ম্ম-পদ্ধতি শিক্ষার দ্বারা বাল্যকাল হইতে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, এবং গার্হস্থ্য জীবনোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভোপযোগী ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের অনন্য আশ্রয় স্বরূপ শিক্ষা-দীক্ষাপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমাজ ও দেশহিতাকাঙ্ক্ষায় অকাতরে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তদানীন্তন আর্য্য-সমাজ বালকগণের শিক্ষার জন্য সাধারণতঃ

অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ বৎসর বয়সে উপনয়নাদি প্রদানান্তর গুরুগৃহে রাখিতেন। তথায় বালকগণ ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ অথবা তদর্দ্ধ কিংবা তদর্দ্ধ, প্রত্যুত যতদিন শিক্ষা শেষ না হয়, ততদিন যাবৎ শৌচাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া শরীর, বাক্য, মন ও বুদ্ধি সংযম করতঃ গুরুসন্নিধানে থাকিয়া, শুশ্রূষার দ্বারা গুরুর সন্তোষোৎপাদন পূর্ব্বক প্রতিদিন নিয়মিতরূপে বেদাধ্যয়ন করিতেন; এবং প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ শৌচ ও প্রাতঃকৃত্য উপাসনাদি সমাপনান্তর গুরুর প্রয়োজনমতে জল, পুষ্প, গোময়, কুশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি ও ভিক্ষা আহরণ করতঃ গুরুকে অর্পণ করিতেন। গুরু, উপনয়নের পরে শিষ্যকে প্রথমে অন্তর ও বাহির শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সান্ধ্যোপাসনা শিক্ষাদানান্তর বেদ-বিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্য এবং গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমোচিত যাবতীয় শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক যখন দেখিতেন যে, মানবোচিত সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ হইয়া শিষ্যের চিত্ত-ক্ষেত্র প্রশান্ত হইয়াছে; তখন তাহাকে বিবাহ, সন্তানোৎপাদন এবং সামাজিক হিতসাধনের জন্য অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিতেন। এবম্বিধ প্রকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য যখন ফিরিয়া আসিয়া কর্ম্ম-ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তখন তিনি অমানুষিক শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভা-প্রভাবে নর সমষ্টির আবাসভূমি মরজগৎকে ত্রিদিব-বিভব নন্দন-কাননে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেন। তাই তখনকার সময়ে সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি-স্বাস্থ্য সমভাবে বিরাজ করিত।

বর্ত্তমানে ভারতের আর্য্য-সমাজে যদিও পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি

সংগ্রাহক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত নাই, কিন্তু উহার প্রয়োজনের অভাব হয় নাই। বর্ত্তমান ভারত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবল প্রভাবে যে প্রকার দ্রুতপদে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে বিশেষ যত্ন সহকারে নগরে নগরে—দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া প্রাচ্য-শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে; বালকগণকে পুরা-ভারতের পবিত্রভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

তোমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ভরসার একমাত্র স্থল শিশিক্ষু বালকগণ। কারণ প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণ অবহেলাপূর্ণ জীবনের শেষভাগে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিপূর্ণ শক্তিহীন দেহভার বহন করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট সমাজ বা দেশ অধিক কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু ঐ নবোন্মেষিত-শক্তি বালকগণকে যদি কুসংসর্গের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষাপূর্ব্বক পুরাভারতের পবিত্রভাবে গঠন করিতে পারা যায়, তবে তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতে আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবন শক্তিশালীরূপে গঠিত হইতে পারিবে। এবং সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা আনন্দময়ী দেশ-মাতৃকার মুখমণ্ডল আবার প্রসন্নভাব ধারণ করিবে, আবার ভারতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, শক্তি ও স্বাস্থ্যের অমৃতময়ী আনন্দধারা ছুটিবে। আর বালকগণ যদি যত্নপূর্ব্বক ঋষি-কথিত ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা নবীন জীবনে নবশক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টিত না হয়—তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের পীযূষ-প্রস্রবিনী অনুজ্ঞা-বাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া আপাতমধুর উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ দুর্নীতিরাশিকে গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত থাকে, তবে তাহাদিগের সেই আত্মকৃত

মহাপাতকের ফলস্বরূপে দাস-সুলভ হেয় জীবনের হীনকর্ম্মে নিরত থাকিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, শক্তি ও স্বাস্থ্যের অভাবে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে আপনাকে এবং আপন সমাজকে অকালে কাল-কবলে উপঢৌকন দিয়া, জগৎ-পূজিত আর্য্যজাতির অযোগ্য সন্তানগণ পিতৃপুরুষগণের মুখমণ্ডলে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিবে।

যোগ। শাস্ত্র শূদ্রাদি হীনজাতির ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠান বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি ?

দয়া। করিয়াছেন। বীর্য্যধারণব্রতে শাস্ত্রে কাহাকেও বাধা দেন নাই, তবে তাহার অনুষ্ঠান জন্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার বেদাধ্যয়ন, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যে শূদ্রাদিকে যে অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এখন তোমার সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা শুনিবার আবশ্যক নাই। পুরাভারতের প্রতিষ্ঠিত গুণানুসারে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম এখন নাই। বর্ত্তমান ভারত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষাত্রশক্তিতে প্রায় বঞ্চিত ; ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমও প্রায় তদ্রূপ। গার্হস্থ্যাশ্রমের অস্তিত্ব যাহা কিছু আছে তাহাও স্বেচ্ছাচার-কলুষিত। আজ ভারতের যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই দেখিবে শূদ্র জাত্যোচিত হীনতা এবং ভিক্ষুকাশ্রমোচিত পরামুখাপেক্ষিতা প্রবল প্রতাপে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং এখন শিক্ষার্থী মাত্রকেই ব্রহ্মচর্য্যাদির সহিত কর্ম্ম-জীবনের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ।

যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

যে হেতু প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণ শক্তিহীন, সেই হেতু তাঁহাদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই কি ?

দয়ানন্দ। তাহা নহে। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে ; তবে শক্তিহীনতা প্রযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলেও যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন ; প্রত্যুত কর্ম্মজীবনের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াদি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁহারা প্রায়শই মাতৃ পিতৃ স্থানীয়। বালক বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষক তাঁহারা যেমন নিজে করিয়া, মুখে বলিয়া, হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ ; তেমন সুযোগ বালক বালিকার ভাগ্যে আর কোথায় জুটিবে ? পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই দেখিবে যে, বালক বালিকাগণ প্রথমে মাতা পিতার, পরে প্রতিবেশিগণের চরিত্র উত্তমরূপে আয়ত্ব করিতে চেষ্টা পায়। সুতরাং মাতা পিতাগণের শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং অনুষ্ঠান চেষ্টা না থাকিলে, স্বীয় সন্তানগণকে কি শিক্ষা দিবেন ? আধুনিক মাতা পিতাগণ সন্তানগণের শান্তি, স্বাস্থ্য, আয়ু, আরোগ্য, বল, বীর্য্য, ধর্ম্ম, ধারণা অক্ষুণ্ণ থাকিবার মত প্রকৃত আত্মোন্নতিকর শিক্ষা

সম্বন্ধে একদিনও চিন্তা করেননা—একদিনও চেষ্টা করেননা। তাঁহারা বালক বালিকাগণের শিক্ষার ভার বেতনভোগী শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পুত্রের পাশের সংবাদ প্রতীক্ষায় নিশ্চিন্ত চিত্তে কালাতিবাহন করেন মাত্র। যদি কিছু চিন্তা থাকে, তবে তাহা পুত্রের ভৃত্য-বৃত্তির এবং অর্থাগম সম্বন্ধীয়। এদিকে পুত্রগণও পীড়নের ভয়ে অল্প বয়সে অমিত পরিশ্রম সহকারে রাশিকৃত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া একটী পাশ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী থাকে। কোমলমতি বালক জানেনা যে, সে পাশ তাহার জীবনের স্বাধীনতাপহারক দাস-সুলভ হেয় জীবনের জন্য লৌহনিগড়—তাহার মাতা পিতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতেছে। বিদ্যা অর্থকরী হইয়া দেশের যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহা বলিবার যোগ্য নহে।

প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ মাতাপিতাগণ সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল বালক বালিকাগণকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারাই দায়ী। সুতরাং তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ঋষি-কথিত শাস্ত্রাদি আলোচনার দ্বারা এবং গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য জীবনোপযোগী ধর্ম্ম ও নীতিপূর্ণ কর্ম্ম-পদ্ধতি ও জ্ঞান সংগ্রহ করতঃ স্বীয় স্ত্রী পুত্র ও প্রতিবেশী বালকগণের সহিত সর্ব্বদা আলোচনা এবং প্রতিদিন নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠানে তাহাদিগকে সঙ্গী করিয়া, তাহাদিগের ধর্ম্মভাবপূর্ণ নৈতিক জীবন গঠনের জন্য প্রয়াস পাইবেন। তবেই সে বালকগণ ভবিষ্যতে আপন আপন পবিত্র জীবনোচিত কর্ম্ম-প্রভাবে সমা-

জের ও দেশের এবং পিতৃপুরুষগণের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

যোগ। কন্যার প্রতি মাতা পিতার কর্ত্তব্য কি?

দয়া। পুত্রের ন্যায় কন্যার প্রতিও মাতা পিতার দায়িত্ব আছে। আজ যে কন্যা, কালে সে মাতা হইবে। মাতার হৃদয়ে যে সুন্দর সুন্দর ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা স্তন্যের সহিত অজ্ঞাতসারে সন্তানের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে; বিশেষতঃ—স্ত্রীজাতি সংসারের মেরুদণ্ডের ন্যায়। জীব-শরীরে মেরুদণ্ডের সহিত সংযোজিত ছোট ছোট অস্থিগুলি যেমন মেরুদণ্ড হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ সংসারে শক্তিরূপিণী রমণীর নিকট হইতে শক্তি, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, স্বামী ও পুত্রগণ স্ফূর্ত্তি সহকারে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। যে দেশের—যে সমাজের মহিলাগণ উন্নতমনা, সে দেশের—সে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কোন লেখক ভারত কুল-কামিনিগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

"তোমরা তাহারা যদি ধ্রুব তারাগণ,
কর তবে ভারতের ভাগ্য নিয়মিত।
জ্ঞান দাও অজ্ঞানেরে জাগাও নিদ্রিতে,
গৃহে গৃহে বীরপূজা কর প্রতিষ্ঠিত।
জননী রূপিনী সদা আরাধ্যা দেবতা,
বীর্য্যবান দেব শিশু করহ সন্তানে।
পত্নী রূপে মন্দিরের মঙ্গল-প্রদীপ,
পবিত্র বীরত্ব-জ্যোতিঃ ঢাল স্বামীপ্রাণে।

ভগিনী স্নেহের লতা,
দুহিতা ত্রিদিব ফুল,
শিখাও মোদের ধর্ম্ম,
ভেঙ্গে দাও যত ভুল।”

বাস্তবিকই ঐ শক্তি স্বরূপিণী রমণিগণ যেদিন ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিতা হইয়া স্বামী পুত্রের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবেন, সেইদিন আবার ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতভূমে শত শত ধর্ম্ম-বীর, কর্ম্ম-বীরের আবির্ভাব হইবে।

কাল' যিনি মাতারূপে মহান্ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া সংসারের মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান হইবেন, আজ সেই কন্যাকে যদি সৎশিক্ষারদ্বারা ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিতা না করা যায়, তবে কাল, তাহার নিকট সন্তান পালন, সংসার নিয়মন, স্বামীসেবা প্রভৃতির কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

“কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন সমন্বিতা।”

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে পালন করিবে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষাদানান্তর ধনরত্নের সহিত জ্ঞানবান পাত্রে অর্পণ করিবে কিন্তু,—

“অজ্ঞাত পতি মর্য্যাদামজ্ঞাত পতি সেবনাম্
নোদ্বাহেৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্ম শাসনাম্।”

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

“পিতা, পতি মর্য্যাদানভিজ্ঞা—পতিসেবা অনভিজ্ঞা, ধর্ম্ম শাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন না।”

সুতরাং পিতা কন্যাকে স্বামী কি, তাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, সংসার কি, ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মানুশাসনে কি প্রকারে চলিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা না দিয়া, কেবল মাত্র অপক্ক বয়সে স্বামীর কাম-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এবং সেই বালিকার স্বাস্থ্য, স্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কতকগুলি অল্পায়ু, অকর্ম্মণ্য সন্তান প্রসব করিবার জন্য একটী পুরুষের সহিত সংযোজিত করিয়া আপন কর্ত্তব্য সমাধান করিলে, পিতা কেবল মাত্র প্রত্যব্যায়গ্রস্থ হইবেন; এবং সমাজের অনিষ্ট সাধন করিবেন।

তাই বলিতেছিলাম মাতৃ পিতৃস্থানীয় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ নরনারিগণের এ সমস্ত বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও অনুষ্ঠান চেষ্টা থাকা একান্ত আবশ্যক।

———o———

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:o:—

গার্হস্থ্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য।

গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট চিন্তানিবিষ্ট দয়ানেন্দর সম্মুখীন হইয়া যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা বুঝিলাম, এবং ইহাও বুঝিলাম যে, প্রত্যেক জীবনেই উহার অনুষ্ঠান আবশ্যক; কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের সামঞ্জস্য কোথায়! কারণ সন্তানোৎপাদনাভিলাষী লক্ষ লক্ষ বিবাহিত জীবন লইয়াই গার্হস্থ্য আশ্রম গঠিত, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হইবার উপায় কি?

দয়া। ভূল বুঝিয়াছ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ঋষিগণ অসাধারণ আত্মত্যাগ সহকারে বালক মাত্রকেই দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যের সহিত অপর আশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য সাধনোপযোগী যাবতীয়, শিক্ষা প্রদান করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য শক্তির ভাণ্ডার। শিক্ষা এবং অভ্যাস সহকারে ঐ শক্তি-ভাণ্ডার যিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনিই পরবর্ত্তী আশ্রমত্রয়ে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইতে পারেন। সুতরাং গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই ত্রিবিধ আশ্রমেই ব্রহ্মচর্য্যাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধানকর্ত্তা

জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ. সেই গৃহস্থাশ্রমে কলুষিত—কুৎসিত চিন্তার রাজ্যবিস্তার অজিতেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছাচার প্রসূত; তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? ঋষিগণের উপদেশ এই যে, অগ্রে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হও, পরে বিবাহ কর। তাই তাঁহারা শৈশবের পরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে গার্হস্থ্য আশ্রমের অনুষ্ঠান এবং বিবাহাদি বিধান করিয়াছিলেন।

"এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্র তপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥
অথানন্তরমাবেক্ষণ্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা স্নয়াদ্ গুর্বনুমোদিতঃ।
গৃহং বনং বোপবিশেৎ পব্রজেদ্বা দিজোত্তমঃ॥
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎ পরশ্চরেৎ
গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাং।"

মহাভারত।

ভগবান ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন—"এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া তীব্র তপস্যার দ্বারা বিষয়-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং সম্পুর্ণ নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া যখন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবেন; তখন ব্রহ্মচর্য্যের পরবর্ত্তী যে কোন আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, বেদ-পরিক্ষা প্রদানান্তর গুরুকে দক্ষিণা দিবেন এবং গুরুর অনুজ্ঞানুসারে স্নান করিবেন, এবং আপন ইচ্ছানুসারে গৃহস্থ, বনচারী অথবা পরিব্রাজক হইবেন, অথবা ইচ্ছা করিলে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করিতে পারেন; কিন্তু

আমাগত প্রাণ হইয়া অন্যথা আচরণে ক্ষান্ত রহিবেন, এবং গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলে আপনার সদৃশ অনিন্দিতা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিরেন।

ঋষিরা যে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী বালকগণকে গার্হস্থ্য আশ্রমোপযোগী শিক্ষা বিশেষভাবে প্রদান করিতেন, তাহা পুরাণ, সংহিতাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়। শাস্ত্র সমূহের প্রায় অংশই গাহস্থ্য জীবনোপযোগী শিক্ষা দীক্ষায় পরিপূর্ণ। পরবর্ত্তী অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের মেরুদণ্ড স্বরূপ গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইলে মানব ক্রমোন্নতির বিধানানুসারে পরবর্ত্তী আশ্রমের অধিকারী হয়, সুতরাং উক্ত আশ্রম যাহাতে কলুষিত বা শক্তিহীন না হয় তাহার জন্য বিশেষ ভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক; অতএব গার্হস্থ্য আশ্রমকে শক্তিশালি করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

গৃহস্থজীবনের পূর্ণতার জন্য বিবাহ আবশ্যক; কিন্তু বিবাহিত জীবনে আসঙ্গলিপ্সা পরিপূরণার্থ স্বেচ্ছাচার বিবাহের উদ্দেশ্য নহে।

"গৃহ্লামি তে সৌভগত্বায়।"

'সৌভাগ্য অর্থাৎ কান্তি, শ্রী. জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্য্যাদির পরিপূরণ জন্য আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি,' ইত্যাদি বেদোক্ত বৈবাহিক মন্ত্র এবং

"ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।"

ভার্য্যাকে মাতার ন্যায় সযত্নে প্রতিপালন করিবে; কদাপি

তাড়না করিবেনা'—ইত্যাদি তান্ত্রিক উপদেশবাক্য স্মরণ করিলে বুঝাযায় যে, বিবাহ কাম-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নহে, ধর্ম্মচর্য্যাদির সহায়তার জন্য। তবে সে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যা সুরক্ষিত হইবে না কেন ?

যোগ। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনং।"

"পুত্র পিণ্ডপ্রদান দ্বারা পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া পুত্রলাভার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।"

দয়া। উহার মধ্যেও নিগূঢ়ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে !

জনন কার্য্য প্রকৃতির ধর্ম্ম, এবং মানব মাত্রেই প্রকৃতি-ধর্ম্মাক্রান্ত ; সুতরাং প্রজা জনন মানবের ধর্ম্ম। উক্তবিধ প্রজা জনন দ্বারা স্বেচ্ছাময় প্রভু শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট হইতেছে। যে হেতু জীব-জগৎ ধ্বংসশীল, সেই হেতু জনন বন্ধ হইলে শ্রীভগবানের সৃষ্টি ধ্বংস হইবে—পরিবর্দ্ধিত হইবে-না ; এই আশঙ্কায় ঋষিগণ পিণ্ডোদকের দ্বারা পিতৃলোকের স্বর্গ বা পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য শাস্ত্র-বিধান করিয়াছেন। বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ। স্বেচ্ছাচার দ্বারা বিবাহের সদুদ্দেশ্য কলুষিত হইলে, কতকগুলি কুফল প্রসব করে মাত্র। দার পরিগ্রহ কালে কতকগুলি বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ; তাহার এক অংশ এইরূপ যথা :—

"গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া
পত্যাভারদষ্টির্যথা সঃ। ভগোহর্যমা দেবঃ সবিতা
পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি
মাত্বং মাত্বমসা মোহহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং
দ্যৌরহং পৃথিবীত্বং। তাবেহি বিবাহ বহৈ
সহরেতো দধাবহৈপ্রজাং প্রজনাবহৈ
পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহুংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ
সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ পশ্যেম শরদঃ শতম্
জীবেম শরদঃশতম্ শৃণুয়াম শরদঃশতম্॥"

'কান্তি, শ্রী, জ্ঞান, ধর্ম্মাদির পরিপূরণের নিমিত্ত আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমার আত্মা যেন আমার আত্মা হইতে বিযুক্ত না হয়। ভগ, অর্য্যমা, সবিতা প্রভৃতি দেবতাগণ তোমাকে আমার সহিত সম্মিলিত করিয়াছেন। তুমি আমার গৃহ-কার্য্য করিবে; তোমা হইতে আমার শান্তি, কান্ত্যাদি বিকাশ হইবে। তোমাকে পাইয়া আমি শ্রীযুক্ত হইলাম। ওতঃ-প্রোতঃ সম্বন্ধ বিশিষ্ট শূন্য ও পৃথিবীর ন্যায় আমি সামবেদ ও তুমি ঋক্‌বেদ স্থানীয়া। আমাদের বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় হউক। আমাদিগের উভয়ের রেতঃ সংযম করিতে হইবে; পরে যথা সময়ে পুত্রোৎপাদন করিয়া আনন্দানুভব করিব। এই সম্মি-লনের ফলে আমাদিগের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হইবে। আমরা শত শত বৎসর জীবিত থাকিব, শত শত বৎসরের ঘটনা দেখিতে শুনিতে পাইব।'

এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, বিবাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পবিত্র-ভাব ভিন্ন কোনও প্রকার কলুষিত ভাব নাই, এবং পুত্রোৎ-

পাদন যে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহাও রেতঃ সংযমের ফল।

"অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

(সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি) 'অপত্যোৎপাদনের জন্য তীব্র নিয়মাবলম্বন করিলেন; সময় মত নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী এবং জিতেন্দ্রিয় হইলেন।'

বুঝিয়াছ যোগজীবন; স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত কাম-ক্রীড়ার পরিণাম পুত্রোৎপাদন নহে; পুত্রোৎপাদনের জন্য জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। তাহার ফলেই সুপুত্র উৎপাদিত হইয়া সমাজ, সংসার ও মাতাপিতার মুখোজ্জ্বল করিবে, নতুবা অজিতেন্দ্রিয় স্বেচ্ছাচারীর কাম-ক্রীড়ার পরিণাম ফলে অল্পায়ু, অসুস্থ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, অমেধাবী, উচ্ছৃঙ্খল সন্তানগণ জন্মিয়া পিতার দারিদ্র্য, মাতার কর্ম্মভোগ এবং দেশের ভার বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

বলিতে পার যে অপত্যোৎপাদন করিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ হইতে পারে; সত্য, কিন্তু ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য নষ্ট হয় না। কারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখাই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে সন্তানোৎপাদন করিলে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হয়না। পুরাভারতের মুনি ঋষি এবং অনেক গৃহস্থগণ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণের রমণীর সহিত কায়িক সংযোগের ফলে অভিলষিতরূপে পুত্র অথবা কন্যা উৎপাদিত হইত, এবং সেই সন্তান মাতাপিতার

উদ্দেশ্য সাধন ও তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইত। তদানীন্তন কালের মাতাপিতাগণ জানিতেন যে,—

"লোকান্তর সুখং পুণ্যং তপোদান সমুদ্ভবম্।
সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহ্ চ শর্ম্মণে।"

'তপোদানাদি সম্ভূত পুণ্যরাশি লোকান্তরেই সুখোৎপাদন করে, পবিত্র কুলোদ্ভব সন্ততি কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় লোকেই সুখের কারণ হইয়া থাকে।'

অধুনা স্ত্রীসংসর্গ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিলে কামুক ব্যতীত আর কিছু বুঝা যায় না। সুতরাং বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব আশঙ্কা হইতেই পারে, প্রত্যুত কৌমার অথবা অবিবাহিত জীবনেও নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া শক্তি ধ্বংস করা হইয়া থাকে।

যোগ। সংসর্গ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত কি, এবং মানবের ইচ্ছানুসারে পুত্র অথবা কন্যা উৎপাদন হয় কি প্রকারে?

দয়া। প্রকৃতি সর্ব্বত্রই আমাদিগকে এই সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। বৃক্ষ লতাদির দিকে চাহিয়া দেখ, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যতীত ফল বা পুষ্প প্রসব করে না। গবাদি পশুগণের প্রতি মানবে হস্তক্ষেপ না করিলে, তাহারা উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্থাৎ অবস্থানুসারে শক্তি ও স্বাস্থ্য পূর্ণতা লাভ না করিলে গর্ভ গ্রহণ করে না; কিন্তু মানুষ কালাকাল চিন্তা না করিয়া অযথা আত্মক্ষয় করিতে কুণ্ঠাবোধ

করে না। এই শ্রেণীর মানুষের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এবং কালে উহা অদৃষ্ট দোষে পরিণত হয়।

দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান এবং এক প্রকারের ধর্ম্মচর্য্যাদির দ্বারা যখন স্ত্রী পুরুষের তাড়িৎ-শক্তির সামঞ্জস্য হয়, এবং যখন স্ত্রীর শক্তি ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তান পালন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থা হয়, প্রত্যুত কামের উদ্দীপনাশক্তি হ্রাস হহয়া হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ করে, তখন ঋতুর পরবর্ত্তী যোড়শ দিবস যাবৎ গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত সময়।

সুস্থ শরীরে প্রতি অষ্টাবিংশতি দিন পরে ঋতুকাল উপস্থিত হয়, এবং ঋতুর প্রথম কয়েকদিবস জরায়ু ঋতু-শোণিতে পূর্ণ থাকে ও পুনঃপুনঃ স্রাব হইতে থাকে। সুতরাং যে কয়েকদিবস যাবৎ ঐ শোণিতস্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন কখনই গর্ভোৎপাদন সম্ভব নহে। তৎপরে স্ত্রী ঋতুস্নানান্তে পবিত্রভাবে গর্ভগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। পুরুষও যখন দেখিবেন শক্তি ও স্বাস্থ্য-পূর্ণ শরীরে শান্তি অনুভব করি-তেছেন, এবং তরলতা প্রভৃতি কোন প্রকার বীর্য্য বিকার নাই, বীর্য্যে সন্তানোৎপাদক কীটের (যাহা বীর্য্যের অল্পতা এবং তরলতা হইলে জীবিত থাকিতে পারে না) অভাব হয় নাই, তখন কামশুন্য প্রশান্ত-হৃদয়ে পবিত্রভাবে অভিলাষিণী রমণীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিবেন।

ঋতুর পরে জরায়ু শুষ্ক হইলে ৬।৮।১০ প্রভৃতি যুগ্মদিবসে সহবাসের ফলে অল্প পরিমাণ ঋতু-শোণিত এবং অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ শুক্রের সংমিশ্রণে পুত্র এবং ৫।৭।৯ প্রভৃতি অযুগ্ম

দিবসের সহবাসের ফলে অধিক পরিমাণ ঋতু-শোণিত এবং অল্প পরিমাণ শুক্রের সংমিশ্রণে কন্যা সন্তান উৎপাদিত হয়। ষোড়শ দিবস পরে সহবাসের ফলে গর্ভোৎপাদন হয় না। সহবাস কালে স্ত্রী ও পুরুষের শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্ম্মক্ষম না থাকিলে, উৎপাদিত সন্তানে সেই প্রকার দোষ জন্মে। অতি সংক্ষেপে সার কথা বিবৃত করিলাম। এখন দেখ, একটী জীবনে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেই যথেষ্ট হয়। সেই তিনদিন স্ত্রীর সহিত কায়িক সংযোগের ফলে সমস্ত জীবন-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য নষ্ট হইতে পারে না।

মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণ প্রণীত পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ স্বরূপ দিন-চর্য্যা, দারাভিগমন প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার আলোচনা করিলে জীবন গঠনোপযোগী অনেক বিষয়ের বিশদ জ্ঞানার্জ্জন হইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া গুরু অথবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সহিত মধ্যে মধ্যে তাহার আলোচনা করিতে হইবে; নতুবা বুঝিতে ভুল হইতে পারে।

আমি তোমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য দারাভিগমন সম্বন্ধে মনুসংহিতা হইতে কয়েকটী মাত্র শ্লোক বলিতেছি, এবং দিন-চর্য্যা অর্থাৎ নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে পরে বলিব।

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃষোড়শা স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥

মনু ৩॥ ৪৬॥

তাসমাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রীয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিষেদার্ত্তবে স্ত্রীয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রীভবেত্যধিকো স্ত্রিয়াঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥ ৫০ ॥"

"শিষ্ট-নিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে। ৪৬।

তন্মধ্যে প্রথম চারিরাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ এই ছয় রাত্রি স্ত্রী গমনে অপ্রশস্ত; অবশিষ্ট দশ রাত্রি প্রশস্ত।৪৭।

এই দশ রাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আট, দশ প্রভৃতি যুগ্ম রাত্রে স্ত্রী-গমণ করিলে যদি গর্ভ হয়, তাহাতে পুত্র জন্মে; এবং পাঁচ সাত ও নয় প্রভৃতি অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে যদি গর্ভ হয়, তবে কন্যা সন্তান জন্মে। এজন্য পুত্রার্থীর পক্ষে ঋতুকালে যুগ্ম দিবসে স্ত্রীগমন বিধেয়। ৪৮।

অযুগ্ম রাত্রি হইলেও পুরুষের বীর্য্যাধিক্যে পুত্রসন্তান জন্মে। যুগ্ম রাত্রি হইলেও স্ত্রীর ঋতু-শোণিত অধিক হইলে কন্যা সন্তান জন্মে এবং উভয়ের সমান হইলে ক্লীব অথবা যমজ পুত্র বা কন্যা হয়। আবার যদি উভয়েরই শক্তি অসার বা অল্প হয়, তবে গর্ভ হয় না। ৪৯।

যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয়রাত্রি অর্থাৎ প্রথম চারি রাত্রি এবং

একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি ও অনিন্দিত দশরাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্টরাত্রি পরিহার করিয়া অবশিষ্ট দুইরাত্রি অথচ যাহাতে কোন পর্ব্ব অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী তিথি বা সংক্রান্তি নাই, এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুযায়ী শুভ তিথি-নক্ষত্র ও গ্রহাদির সংযোগ হইয়াছে, সেই রাত্রিতে অভিগমন করেন, তিনি যে আশ্রমবাসীই হউন না কেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নষ্ট হইবে না।”

সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকাও আবশ্যক, কিন্তু বাহুল্য বিবেচনায় আমি তাহা এখানে আলোচনা করিলাম না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যে চিত্ত-বৃত্তি।

কয়েক দিবস যাবৎ ধারাবাহিক আলোচনা শুনিয়া যোগ-জীবনের শ্রবণ-লিপ্সা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাই নিয়মিত সময়ে স্বামী দয়ানন্দ যেমন বায়ু সেবনার্থ জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হন, যোগজীবনও তেমনি নিয়মিত ভাবে তাঁহার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার প্রশ্নের দ্বারা কৌতূহল নিবৃত্ত এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানোপযোগী উপায় অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। অদ্য যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—প্রভো! যাহারা অদ্যাবধি এ সব বিষয়ে মনঃসংযোগ করে নাই, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনকে দুঃখ-দাহনের জ্বলন্ত জিহ্বা হইতে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় আছে?

দয়া। কেন থাকিবে না? অবশ্যই আছে। অধ্যবসায় মানব-জীবনের অমূল্য রত্ন; মানব ঐ রত্ন-প্রভাবে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতাসহকারে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও দৃঢ় প্রযত্ন হইলে, জীবনের অবশিষ্ট সময়ে সুফল ভোগ করিতে পারেন।

শক্তি হীনতা যেমন কর্ম্মোৎসাহ নষ্ট করে, তেমনি কর্ম্ম-চেষ্টায় আবার শক্তি পরিবর্দ্ধন করে ;—কর্ম্ম করিতে করিতে শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পুরাণ ইতিহাসে এরূপ অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কর্ম্ম-চেষ্টার ফল-মাহাত্ম্যে অনেকে (চ্যবন, সৌভরি, শিল্হন, বিল্বমঙ্গল) বার্দ্ধক্যে যৌবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের ভগ্নহৃদয়ে এরূপ কল্পনা যদিও দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া বোধ হয়, তবুও ঐ প্রকারে কর্ম্ম করিতে করিতে আজন্মকৃত অকর্ম্মজ-কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া হৃদয়ে সুসংস্কারের আবির্ভাব হয় ; এবং তাহারই ফলে এ জীবনের অবশিষ্টাংশে এবং পর জীবনে মানব অনন্ত উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারে।

যোগ। পর জন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর-রহস্য জানিবার জন্য কৌতূহল হইতেছে, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।

দয়া। আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে আপাততঃ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটী মাত্র বলিতেছি, পরে সুবিধা হইলে বিশদভাবে বিবৃতি করিতে চেষ্টা করিব।—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ"॥

'বায়ু যেমন পুষ্পের গন্ধকে বহন করিয়া অবিকৃতভাবে স্থানান্তরে উপস্থিত করে, জীবাত্মাও তেমনি স্থূলদেহকৃত কর্ম্মের-ভাব বা সংস্কার সমষ্টি লইয়া দেহান্তর অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ করে।'

অনন্ত—অসীম শক্তি, মানবের মধ্যে চিরদিন সমভাবে অব-

স্থিত রহিয়াছে,কিন্তু কলুষিত কর্ম্মের আবরণে উহা ঢাকিয়া যায় ; আবার পবিত্র কর্ম্মের আঘাতে ঐ আবরণ উন্মোচিত হইতে পারে ; এবং যখন আবরণ উন্মোচিত হয়, তখন শক্তি স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ঐ শক্তি অধিকতর প্রস্ফুট হইলে, মানব সাধারণের সমক্ষে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কর্ম্ম ও শক্তি ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং উহার প্রভাব এক জীবন হইতে অপর জীবনে, অথবা এক জন্ম হইতে অপর জন্মে পরিচালিত হইয়া অধিকতর সত্তার বিকাশ করিতে থাকে।

যোগ। বুঝিলাম যে, চেষ্টা করিলে সকলেই সুফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন, সুতরাং সকলকেই আপন জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাপনের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিৎ।

এখন কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহাই বিবৃতি করুন।

দয়া। আমি যথাসাধ্য বলিতেছি, তুমি স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই একখানা দেশে বেশ আদরের সহিত গৃহিত হইয়াছে। তুমি সেই সব গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পার। তবে,—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চকালঃ বহুতা চ বিঘ্না॥
যৎ সারভূতং তৎ উপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রং" ॥

'শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও অনেক, কিন্তু আয়ু অল্প, তাহাতে আবার বহু বিঘ্ন, অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে তাহার সার ভাগ দুগ্ধই গ্রহণ করে, সেইরূপ শাস্ত্রাদি হইতে উপদেশের সার ভাগ গ্রহণ করিবে।'

লোকহিতকামী মহামনস্বী আর্য্য-ঋষিগণ,অনন্ত অসীম জগৎ-রাজ্যে মানবের বিদিত হইবার বহু বহু বিষয় আছে বুঝিয়া,লোক-শিক্ষার জন্য অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত শাস্ত্র আমাদিগের অনন্ত উন্নতিসাধক কর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষার ভাণ্ডার, কিন্তু কাল সহচরে কর্ম্মবশে মানব বহু বিঘ্ন পূর্ণ অল্পায়ু হওয়ায়, ঋষিগণ কথিত পূর্ব্ব বিধান মতে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তদনুসারে জীবন পরিচালন করা আজকালকার দিনে অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের ভাল মন্দ বহুভাব সমূহের সংমিশ্রণে অদূরদর্শী আমরা এমন এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যে, আপন আপন উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ অসুবিধাগুলি দূর করিতে উপায় অনুসন্ধান করিয়াও ফললাভে সমর্থ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন কতকটা ইচ্ছা সত্ত্বে এবং কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে আদব কায়দা (Etiquette) চাল' চলন (Deportment) পসার প্রতি-পত্তির (Prestige) দায়ে পড়িয়া আহার আচ্ছাদনাদির আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনের আনুপাতিক হিসাবে উপার্জ্জনের অবস্থা ভাল হইতেছেনা, সুতরাং জীবনের অধিকাংশ সময় সেই চিন্তায় অতিবাহিত করিতে হয়; ফলে জীবনের প্রকৃত চিন্তায় দেশ নিতান্ত অনাস্থাবান হইয়া

এক একটী প্রবল ভাবের বিকাশ করিতেছে; আবার আর একটী ভাব বা অবস্থা তাহার সহিত মিলিত হইয়া উহাকে অত্যন্ত প্রবল করিয়া তুলিতেছে; এবং মানব-মন তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহার প্রবল আঘাতে আপনার সত্তা হারাইয়া তাহার দাস হইয়া পড়িতেছে।

মনে কর স্বাভাবিক শক্তি-প্রভাবে কামিনী হইতে প্রবলতর কাম-ভাবের বিকাশ হইতেছে। যদি সৌন্দর্য্য, মলয়ানিল, কুসুম-সৌরভ ও নির্জ্জনতা উহার সহিত মিলিত হয়, এবং যদি কোন যুবাপুরুষ উহার নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাহার পাশব-বৃত্তি অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া তাহাকে মনুষ্যত্বহীন পশুতে পরিণত করিয়া তুলে। পুষ্পের ন্যায় পবিত্র বস্তু বহির্জগতে আর কি আছে, কিন্তু যদি উহা কামিনীর ভূষণে পরিণত হয়, তবে ঐ পুষ্প কি প্রকার প্রবল পাপ চিন্তার আবির্ভাব করে বল দেখি? এই প্রকারে অর্থে অহঙ্কার, আহার্য্যে লোভ, সৌন্দর্য্যে মোহ, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় প্রবলভাবের বিকাশ করে। আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধক রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি বহির্জগতের নানা বিষয় হইতে আবির্ভূত হইয়া নিরন্তর আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করতঃ আমাদিগের মনের উপরে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেছে। আমাদিগের মন সাধন-শক্তিহীন দুর্ব্বল হইলে, অনেক সময়ে অবশ ভাবে তাহাদিগের দাস হইয়া পড়ে; এবং পবিত্র সত্তাযুক্ত স্বাধীন-শক্তিহীন দাস-স্বভাব মনের প্ররোচনায় ইন্দ্রিয়গণ ভয়ানক কার্য্যগুলিও সম্পাদন করিয়া ফেলে।

চেতনা শক্তিহীন মন মস্তিষ্কের সাহায্য লইয়া কি প্রকারে চেতনের ন্যায় কার্য্য করে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। মনকে কখন কখন চিত্ত বলা হয়, এখন দেখা যা'ক মনোবৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি কাহাকে বলে।

"বিষয় যোগাৎ চিত্তস্থ যা পরিণতি সা বৃত্তিঃ"।

পাতঞ্জলদর্শন।

বিষয়ের সহিত সংস্রব হইলে চিত্তের যে পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহাকে বৃত্তি কহে।'

সংকল্পও বিকল্পাত্মক শক্তিকে মন বা চিত্ত কহে। সংকল্প ও বিকল্প শব্দের সাধারণ ভাবার্থ, গ্রহণ ও ত্যাগের ইচ্ছা। ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন নিয়তই কর্ম্মশীল; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মন জগতের সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল বিষয় জাতকে একটী একটী করিয়া অথবা যুগপৎ দুই চারিটী একত্রে গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। এই প্রয়াসকে সাধারণতঃ চিন্তা নামে অভিহিত করা হয়; দার্শনিক ভাষায় এই চিন্তাকেই বৃত্তি কহা যায়।

চিত্তের পরিনাম পরিণতিকে "বৃত্তি" কহে। মনের বা চিত্তের পরিণাম পরিণতি কি প্রকারে হয়, তাহা পূর্ব্বে একাধিক-বার বলা হইয়াছে। এখন চিত্তের কি কি প্রকার পরিণতি হয় তাহাই আলোচনা করা যাক্।

"চিত্তস্য ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং
নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থা) সন্তি।"

'ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তের এই পাঁচ প্রকার অবস্থা।'

ক্ষিপ্ত= চিত্তের অত্যধিক চঞ্চল অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। মন যখন একটা ছাড়িয়া আর একটী—আর একটী, এই প্রকারে নিরন্তর বিষয় গ্রহণে ব্যাপৃত থাকে, তখন মনের সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্ত-বৃত্তি কহে।

মূঢ়= মন যখন নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলস্য প্রভৃতি অজ্ঞানময় কার্য্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে মনের বা চিত্তের মূঢ়াবস্থা কহে।

বিক্ষিপ্ত= ক্ষিপ্তাবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য অতি কম। মন যখন অত্যন্ত চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া পরিণাম দুঃখজনক পার্থিব সুখে বীতস্পৃহ হইয়া অপার্থিব সুখের চিন্তায় ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তখন মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা কহা যায়।

একাগ্র=চিত্ত যখন কোন এক বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চঞ্চল নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থির অবস্থায় অবস্থিত থাকে; অথবা প্রকাশময়, সুখময়, সাত্ত্বিক অবস্থা মাত্রে প্রবাহিত থাকে, তখন মনের একাগ্র অবস্থা কহা যায়।

নিরুদ্ধ= মনের নিরুদ্ধ অবস্থা যোগ সাধনার চরমোৎকর্ষ মনের এই প্রকার অবস্থা হইতে যোগী সমাধি বা সিদ্ধি লাভ করেন। মনোবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় আবিষ্কর্ত্তা মহামুনি পতঞ্জলি যোগীর লক্ষ্য মনের এই চরম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যোগ শব্দের বিবৃতি করিতে বলিয়াছেন;—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"

পাঃ সমাধিপাদ ২য় সূত্র।

মনের বৃত্তি সমূহ অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিকে সম্যক প্রকারে নিরোধ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিতি করাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বা যোগ কহে।

মনের এই যোগ-লক্ষ্য নিরুদ্ধ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু অদ্য আমরা সে সম্বন্ধে অধিক কিছু আলোচনা করিব না।

মহামুনি পতঞ্জলি চিত্ত-বৃত্তি সমূহকে সাধারণতঃ ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বোধ-সুগম করিয়াছেন। যথা—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্য ক্লিষ্টাক্লিষ্টা"।

পাঃ সমাধিপাদ ৫ম সূত্র।

পূর্ব্বকথিত পাঁচটী বৃত্তির কয়েকটী ক্লিষ্টা অপর কয়েকটী অক্লিষ্টা। যে প্রকার বৃত্তি সমূহ হইতে পরিণামে মনের অবসন্নতা উপস্থিত হয়, সেই প্রকার বৃত্তি সমূহকে ক্লিষ্টা-বৃত্তি কহে। আর যে প্রকার চিন্তা প্রবাহ হইতে মনের অবসন্নতা উপস্থিত করে না, বরং মনের সুখময়—আনন্দময় অবস্থা উপস্থিত করে, এবং ক্রমোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনকে এমন কি আনন্দ-সাগরের অসীম গভীরতা মধ্যে অনন্তকাল নিমজ্জিত করিয়া রাখে, তাহাকে মনের বা চিত্তের অক্লিষ্টা বৃত্তি কহে।

চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এই তিনটী অবস্থাকে কষ্টদায়ক ক্লিষ্টা-বৃত্তি কহে। ইহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র রজোগুণ হইতে চিত্তের ক্ষিপ্ত এবং তমোগুণ হইতে মূঢ়াবস্থা উপস্থিত হয়। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অল্প

পরিমাণ সত্ত্বগুণ মিশ্রিত রজোগুণের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। ইহা ক্ষিপ্ত অর্থাৎ চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তির সামান্য উন্নীত অবস্থা মাত্র।

চিত্তের একাগ্র অবস্থায় অল্পমাত্র রজোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণের উপলব্ধি করা যায়; সুতরাং চিত্তের এই একাগ্র অবস্থা সত্ত্ব গুণোদ্ভূত এবং ইহাই চিত্তের নির্ম্মল অবস্থা। মনুষ্যত্ব অর্জ্জন-কামী ব্রহ্মচর্য্য সাধকের চিত্ত-ভূমিতে অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক এই প্রকার নির্ম্মল অর্থাৎ একাগ্র অবস্থা আনয়ন করিতে হইবে। নতুবা ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিবে না। মন ও মস্তিষ্ক ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, অর্থাৎ মনের অবস্থা হইতে মস্তিষ্কের অবস্থা এবং মস্তিষ্কের অবস্থা হইতে মনের অবস্থা উৎপন্ন হয়। চঞ্চল-স্বভাব রজোগুণের ক্রিয়া সৃষ্টি, সুতরাং অধিকাংশ সৃষ্ট-পদার্থেই রজোগুণের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিক ভাষায় ঐ সৃষ্ট-পদার্থ সমূহকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কহে। স্বাভাবিক চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন একটী ছাড়িয়া আর একটী আর একটী, এই প্রকারে নিরন্তর বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতেছে; এবং তাহার ফলে মনে স্বতঃই রজোগুণের আবির্ভাব হইতেছে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকার ক্ষিপ্ত অর্থাৎ রজোগুণ প্রবল চঞ্চল মনের নিরন্তর আঘাতে মস্তিষ্কেও বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের এইপ্রকার রজোগুণ প্রবল বিক্ষেপযুক্ত অর্থাৎ চঞ্চল অবস্থা হইতে কামাদি কলুষিত-বুদ্ধি সমূহ উৎপাদিত হইয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সেই সেই বুদ্ধির লক্ষ্য সমূহকে সাধন করিতে উত্তেজিত করে; তাহারই ফলে মানুষ কামুক, ক্রোধী বা লোভী হইয়া উঠে। ক্রমে কাম, ক্রোধ বা লোভের বিষয়

সমূহকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্কে ও মনে অত্যন্ত তমোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া মানবকে ধ্বংস-মুখে অগ্রবর্ত্তী করে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভি জায়তে।
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ
> স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"
>
> গীতা ২।৬২—৬৩

'বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে সংসর্গ জন্মে, সংসর্গ হইতে অভিলাষ হয়, অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রোধের ফলে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি নষ্ট হয়, স্মৃতি হীনতা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়।'

এখন অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, রজোগুণ সম্ভূত চাঞ্চল্য-যুক্ত কলুষিত-চিত্ত হইতে মুখ্য ও গৌণ ভাবে মনুষ্যত্ব সংহারক ব্রহ্মচর্য্যনাশক বীর্য্যক্ষয়কারী কামাদি উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য সাধক, রজঃ ও তমো গুণ সম্ভূত ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে অপসারিত করিয়া চিত্ত-ভূমিতে একাগ্রতা সম্ভূত নির্ম্মলচিত্ত-বৃত্তি জন্মাইতে না পারিলে অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য সাধন হইবে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যে যোগ।

—:০:—
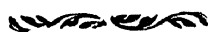
সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থ জাহ্নবীতটে সমাসীন স্বামী দয়ানন্দের সম্মুখে উপবিষ্ট শিশিক্ষু যোগজীবন প্রতিদিন গল্পচ্ছলে শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এখন প্রতিদিন তাঁহার হৃদয়ে নূতন নূতন প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেছে এবং দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দয়ানন্দও যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছেন।

অদ্য যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্য আপনার কথায় বুঝিলাম যে, চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য সাধন অসম্ভব, এবং সত্ত্ব প্রধান একাগ্রবৃত্তি ব্যতীত, রজস্তমঃ প্রধান ক্ষিপ্তাদি বৃত্তির দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত লাভ করা যায় না; কিন্তু একাগ্রতা সাধন অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। অর্জ্জুনের ন্যায় মহাত্মা যখন বলিয়াছেন যে ;---

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্"

গীতা ৬।৩৪

'হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের বাসনানুবন্ধ

হেতু দুর্ভেদ্য। আকাশে গতিশীল বায়ুকে অবরোধ করার ন্যায় মনকে নিরোধ করাও অত্যন্ত দুষ্কর।'

তখন আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যগণের পক্ষে তাহা আকাশকুসুম বলিয়া বোধ হইতেছে।

দয়া। শ্রীভগবান সেই ভীষণ রণস্থল পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, মহামুনি ব্যাসদেব তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া ছিলেন কেন? উহা একা অর্জ্জুনের শিক্ষার বিষয় নহে; সাধারণের শিক্ষার বিষয়। সে যাহা হউক শ্রীভগবান অর্জ্জুনের ঐ প্রকার বাক্যের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

গীতা ৬।৩৫

'হে মহাবাহো! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুষ্কর বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণার দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়।'

যোগ। কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ বিষয়ে বিতৃষ্ণা অর্থাৎ বৈরাগ্য।

যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই জীবনধারণোপযোগী আহারাচ্ছাদনের জন্য অত্যধিক পরিমাণে বিষয় বিজড়িত। বিষয়কে বিষবোধে পরিহার করা কি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবেত' সকলেই সন্ন্যাসী হইবে। সংসার করিবে কাহারা?

দয়া। আধুনিক সংসারের অবস্থা ঐ প্রকারেরই হইয়া উঠিয়াছে ; অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় আজকাল প্রায় সকলেই বাস্তবিক সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না।

ঐশ্বর্য্যে শ্রদ্ধাহীন মহামতি শাক্যসিংহকে রাজ্য-ভোগ-বিজড়িত করিবার জন্য তাঁহার পিতামাতা যেমন প্রথমে গোপানাম্নী একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দ্বারা এক বন্ধন-শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে কতকগুলি নর্ত্তকীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে অনেক পিতামাতাকে তেমন দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থকে বিষয় কহে। যে সমস্ত বিষয়ে—পদার্থে অত্যন্ত রজস্তমঃ গুণাত্মক ভাব বিকাশ করে, সেই পদার্থগুলির সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা না জন্মিলেই চিত্ত-ভূমি নির্ম্মল হইতে থাকিবে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও উহা হইতে পারিবে। কেবলমাত্র অভ্যাস আবশ্যক।

যোগ। সৌন্দর্য্য নয়নকে আকর্ষণ করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। চক্ষুর সহিত মন সেখানে যাইবেই। পৃথিবীতে এ প্রকার অনন্ত অসংখ্য চিত্তাকর্ষক বস্তু রহিয়াছে ; তাহাদিগকে পরিহার করিতে হইলে চক্ষু দুইটীকে চিরদিন নিমিলিত কয়িয়া রাখিতে হয়।

দয়া। প্রকারান্তরেই হউক বা স্পষ্ট ভাবেই হউক, কিছু দিনের জন্য চক্ষু দুটী বুজিতে পারিলেই ভাল হয়। অজ্ঞ বালক পেটে ধরুক বা নাই ধরুক, সন্দেশ দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু তুমি আমি তাহা করি-না, কারণ আমাদিগের

পেটের অসুখ হইবার ভয় আছে। সংসারে যাহারা জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয়নাই, তাহারা বয়োবৃদ্ধ হইলেও বালকের ন্যায় অজ্ঞ। তাহাদিগের ভাল হইতে হইলে, কিছু দিনের জন্য লোভোৎপাদক বস্তু হইতে দূরে থাকিতে হইবে; তাহা হইলে অল্প চেষ্টাতেই মন গঠিত হইবে। চেষ্টা ও যত্নের ফলে যখন বুদ্ধির কেন্দ্রভূমি মস্তিষ্ক সাত্বিকভাব দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে, মন সাত্বিক ভাবে গঠিত হইবে, তখন যেথায় সেথায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও সহসা বিশেষ কিছু হানির আশঙ্কা নাই। চেষ্টা ও যত্নের ফলে মানবজীবনে এমন একটী শুভ দিনের উদয় হইতে পারে যে, সে দিন কামুকের কামানল-বর্দ্ধক কামিনীর কমনীয় কান্তি, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর নিকটে, বালকের চক্ষুতে জননীর প্রীতিপ্রদ পরম পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিভাত হইবে। কান্তা-কর-ধৃত ক্রীড়া-কমল, কল্যাণদায়িণী দেবীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় স্বর্গীয় সৌরভ সুষমা বিতরণ করিবে। রৌপ্যখণ্ডের রুচিকর ঝণৎকার, মস্তিষ্ককে আলোড়ন করিতে সমর্থ হইবে না।

যাঁহারা প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিতে সুযোগ পাইবেন না, তাঁহাদিগকে সমধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, অবনত মস্তকে আলাপ করা এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলা কাম দমনের সুন্দর উপায়। ইহার অর্থ এই যে, অন্য কিছু উত্তেজক বিষয় সর্ব্বদা নয়ন-পথে নিপতিত না হয়, এবং আপন কর্ত্তব্যের দিকে মন সংযুক্ত থাকে। ফল কথা এই যে, নিজে একটু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রলোভনের বস্তুকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

চেষ্টা যত্ন ও শিক্ষার দ্বারা সাধিত হয় না, জগতে এমন কোন কার্য্য আছে ?

যোগ। ভাল—বলুন দেখি কি শিখিতে হইবে ? এবং কি প্রকারে চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে।

দয়া। যোগ অভ্যাস দ্বারা কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি অনিষ্ট-কর অপবিত্র বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং পবিত্র বস্তুতে অনুরাগ ও ভগবানে ভক্তি জন্মাইতে হইবে।

যোগ। একে একাগ্রতা, তাহার পর আবার যোগ শিক্ষা ! সংসারী ও ছাত্রদিগের জীবনে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ?

দয়া। কেন—অসম্ভব কি ?

যোগ। ছাত্রগণ নিত্য নিত্য রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে অসংখ্য বিষয় চিন্তা করিবে, এবং সাংসারিক-গণ সংসারের জন্য অর্থ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি আহরণের চিন্তায় ব্যস্ত রহিবে ; তাহারা নিরবচ্ছিন্ন যত্ন-সাপেক্ষ যোগ বা একাগ্রতা শিখিবে কখন ?

দয়া। যোগের ফল একাগ্রতা। যোগ অভ্যাস করিতে পারিলেই একাগ্রতা অভ্যাস হয়। সে যাই হ'ক পরে বলিব, আপাততঃ শুন !

মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে মুখ্য এবং গৌণ ভেদে বিবিধ কার্য্যের আয়োজন করা অসঙ্গত নহে। অধ্যয়নের আবশ্যকতা স্বধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে, আত্মোন্নতিকর জ্ঞানার্জ্জনের জন্য। জ্ঞান ক্ষিপ্ত-চিত্ত স্থির করণের সহায়ক। সুতরাং চিত্ত-গঠন করিতে অধ্যয়ন অনিষ্টকর নহে, ইষ্টকর। বিশেষতঃ

স্কুল কলেজেও চরিত্র গঠনোপযোগী অনেক আখ্যায়িকা অধ্যয়ন করান হয়। বালকগণ যখন পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিবে, তখন যত্ন সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে অধ্যয়ন করিবে মাত্র। এমন কি তখন ভবিষ্যৎ জীবনে কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবে, তাহার জল্পনা কল্পনাও করিবে না। এই প্রকারে বৈষয়িকগণ, কর্ত্তব্যজ্ঞানে মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক বৃথা জল্পনা কল্পনা পরিহার করিয়া সংসার ভগবানের, সংসারী ভগবানের একজন ভৃত্যরূপে তাঁহারই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া সদুপায়ে সাংসারিক বা ঔপার্জ্জনিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইবে। এই প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত আরও কতকগুলি সত্ব ভাবোদ্দীপক কর্ম্ম, এবং সাত্বিক ভাব বিকাশক পবিত্র পদার্থ ও ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে কিছুদিন পরে দেখিবে যে, চিত্ত পবিত্র ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে এবং তাহারই ফলে কালে প্রগাঢ় একাগ্রতা এবং চিত্ত-ভূমির নির্ম্মলতা উপস্থিত হইবে।

যোগের কথা শুনিয়া তোমার বড় ভয় হইতেছে, নয় কি? ভয় করিও না, শুন। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"তপস্বীভ্যোঽধিক যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিক যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।"

গীতা, ৬।৪৬।

'তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।'

যোগীর দেশে, যোগীর বংশে অর্থাৎ আর্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগের নাম শুনিয়াই ভয় পাইতেছ ? বড়ই পরিতাপের কথা। কিন্তু শুন, অনাহারে, বাতাহারে, গিরিকন্দরে উপবিষ্ট, কঠোর সাধনায় সমাহিত চিত্ত, তত্ত্বাতীত সত্য সনাতন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করণাকাঙ্ক্ষী ; অথবা দুঃখভারহারী ভববারির কাণ্ডারী নিত্য নিরঞ্জন দয়াল ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শনাভিলাষী যোগীর যোগ অত্যন্ত কঠোর আয়াস সাধ্য সত্য ; কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে যোগ সাধনীয় নহে। সাধারণতঃ, যোগ শব্দের অর্থ অন্যরূপ। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্"

'সুকৌশলে কর্ম্ম সম্পাদনেব নাম যোগ।'

যোগ শব্দের অর্থ অন্য প্রকার ও হইতে পারে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কতকগুলি কার্য্যের আয়োজন করিতে হয়। যে নিয়মের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকর কার্য্যগুলি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, সাধারণতঃ তাহাকেই যোগ কহে।

মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য চিত্ত-ভূমির নির্ম্মলতা এবং তাহার জন্য যোগ আবশ্যক। যোগ সাধনোপযোগী প্রণালী গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শন অষ্টবিধ যোগাঙ্গ মধ্যে যম একটী যোগাঙ্গ, এবং তাহার সাধন জন্য ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমঃ"।

'অহিংসা' = জীব মাত্রকেই শারিরীক, মানসিক কোন প্রকারে হিংসা না করা। 'সত্য' = মিথ্যাকথা না বলা ; 'অস্তেয়'

= চৌর্য্যবৃত্তি পরিহার। 'ব্রহ্মচর্য্য' = বীর্য্য ধারণ। 'অপরিগ্রহ' = শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত দান গ্রহণ না করা ইত্যাদিকে যম কহে।

পাতঞ্জল দর্শনের মতে ব্রহ্মচর্য্য যোগের একটী প্রত্যঙ্গ। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য যোগ আবশ্যক। ইহার দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে যোগীগণ যে কঠোর যোগ অবলম্বন করেন, শিশিক্ষু ছাত্রগণ এবং বিষয়ী সাংসারিকগণের জন্য সে যোগ আবশ্যক নহে। যদিও মানবজীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা যোগিগণের ন্যায় যোগারাধ্য ধনকে আয়ত্ত করা; কিন্তু তাহার জন্য যে পূর্ব্বসাধন আবশ্যক, ব্রহ্মচর্য্য তন্মধ্যে অন্যতম মাত্র। তবুও কালদেশ পাত্রের অবস্থানুসারে আপাততঃ উহাই—মুখ্য সাধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা আমাদিগের স্বেচ্ছাচার জীবনে পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত।

অত্যুগ্র রজোগুণ সম্ভূত কামই ব্রহ্মচর্য্যের সাক্ষাৎ স্বরূপে ভীষণ শত্রু। সুতরাং কাম দমনের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। তাহাই স্মরণ করাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ বিবৃতিচ্ছলে মুনিগণ বলিতেছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলী প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ কর্ম্ম নিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয় মুমুক্ষুভিঃ॥"

'নারী-কথা শ্রবণ, বর্ণন; নারীর সহিত ক্রীড়া, রমণী দর্শন, রমণীর সহিত গোপনে আলাপ, রমণী সংসর্গের জন্য সঙ্কল্প বা

চেষ্টা এবং সংসর্গ অর্থাৎ অভিগমন; এই অষ্ট প্রকারকে মনীষিগণ অষ্টাঙ্গ মৈথুন বলিয়া বিবৃতি করিয়াছেন। মুক্তিকামি নর এতদ্বিপরীত আচরণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবেন। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কখনই করিবেন না। কারণ উহার প্রত্যেকটীই অত্যন্ত কামোদ্দীপক।'

উপরোক্ত বিষয় গুলির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলী প্রভৃতি সাতটীকে পরিহার করা এক প্রকার সহজসাধ্য; কিন্তু সঙ্কল্প অর্থাৎ চিন্তাটী পরিহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যে প্রকার কৃষকের অজ্ঞাতসারে ক্ষেত্র-মধ্যে কণ্টক-বীজ পতিত হইয়া, কালে বৃক্ষ-লতায় পরিণত হইয়া ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদিকা শক্তি একেবারেই হ্রাস করিয়া ফেলে; সেইরূপ মানবের অনিচ্ছাসত্ত্বে—অজ্ঞাতসারে কাম-চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, ক্রমে রমনী বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি, এবং ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি তদনুচরবর্গ একত্রিত হইয়া হৃদয়-ক্ষেত্রকে পঙ্কিলপূর্ণ করিয়া তুলে ও তাহারই ফলে মানব, মনুষ্যত্বশক্তি একেবারেই হারাইয়া ফেলে। হৃদয়ের সর্ব্বনাশ সাধক উক্ত প্রকার পঙ্কিলতাপূর্ণ পাপচিন্তাগুলিকে দূর করিতে ইচ্ছা করিলে, ভোগ-বিলাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি মানবদেহ—বিশেষতঃ কামিনী কলেবরের পরিণাম কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিক ভোগে বিরক্তি জন্মে।

"ক্বতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক্ব তদধরমধু ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক্ব চ মদনধনুর্ভঙ্গুরঃ ভ্রূবিলাসঃ?
ইত্থং খট্টাঙ্গ কোটৌ প্রকটিত দশনং মঞ্জু গুঞ্জৎ সমীরং
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহা মোহ জালং কপালং।"

'শ্মশান-খট্টার প্রান্তে মহা মোহের জাল স্বরূপ (মৃত) যুবতী-দেহের মাথার খুলী পড়িয়া রহিয়াছে ; তাহার শুষ্ক—বীভৎস দাঁতগুলির ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া কামান্ধ ব্যক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্য যেন গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে,—যে মুখ-পদ্ম দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতে, যে মদন-ধনু বিনিন্দিত ভ্রূভঙ্গিমার বহু বিলাসের সহিত অপাঙ্গ-ঈক্ষণ দর্শন করিয়া পাগল হইতে, যে অধর-সুধা পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে, তাহা এখন কোথায় ?'

বল দেখি এই গুলি চিন্তা করিলে, সেই সংশ্লিষ্ট উচ্চ পিশিত মাংসপিণ্ডরূপ স্তন, লালাক্লিন্ন মুখমণ্ডল এবং তন্মধ্যস্থ শুষ্ক অস্থি খণ্ড—দশন পংক্তির প্রতি কাহার না বিরক্তি জন্মে ?

এক দিকে যেমন ভোগ-বিলাসের আবাসস্থল কামিনী-কলেবরের নশ্বরতা চিন্তা করিবে; তেমনি অপর দিকে আপনার জীবনের মহত্ত্ব, উচ্চতা, পবিত্রতা এবং বহির্জগতের যাবতীয় বিষয়ে পরম পবিত্র শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক শ্রীভগবানের সত্তা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবে,—যথা,—

> "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম মন্দিরং।
> চেতঃহি নিত্যতীর্থংস্যাৎ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥"

'এই বিশাল বিশ্বমণ্ডল, ব্রহ্মের—ভগবানের আবাসস্থল পবিত্র মন্দির স্বরূপ। জগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার প্রতিচ্ছবি বিশেষ। মানবের চিত্ত-ক্ষেত্র নি[illegible]তীর্থ, এবং সত্যই অবিনাশী শাস্ত্র।'

বাইবেলে এক স্থানে লিখিত আছে,—

"Know Ye not, that Ye are the temple of God; and that the spirit of God, dowelleth in You?

If any man difile the temple of God, him shall God distroy; for the temple of God is holy, which temle Ye are."

'তোমরা কি জাননা যে, তোমরা ভগবানের মন্দির; এবং ভগবানের শক্তি তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন?'

'যদি কেহ ভগবানের মন্দির অপবিত্র করে, তবে ভগবান তাহাকে বিনাশ করিবেন; কারণ ভগবানের মন্দির পবিত্র এবং তোমরাই সেই মন্দির।'

ইহা স্মরণ করিলে—ইহা চিন্তা করিলে, কে আর পৈশাচিক অপবিত্রতাকে আপন হৃদয়ে আহ্বান করিতে সাহসী হয়?

রমণী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উত্তেজনা উপস্থিত হইলে মাতৃ-মূর্ত্তি চিন্তা করিলে হৃদয়ের অপবিত্রভাব দূর হইয়া পবিত্রভাবের আবির্ভাব হয়। অথবা উচ্চৈস্বরে "হরে কৃষ্ণ" নাম গান করিলেও হৃদয়ে পবিত্র ভাব জাগরূক হয়; আর অপবিত্র ভাব আসিতে পারে না।

ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন আচার ব্যবহার, আহার বিহার এবং কর্ত্তব্য গুলি এমন ভাবে নির্দ্দেশ করা উচিৎ যে, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণ উদ্দীপিত হয়। আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত নিত্য-ক্রিয়া-পদ্ধতিই উহার প্রকৃষ্ট পন্থা। শাস্ত্রোক্ত নিত্য-ক্রিয়াই জীবন

গঠনোপযোগী উত্তম যোগ। যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে এই নিত্য-ক্রিয়া রূপ যোগ আচরণ করিলে, তুমি দেখিতে পাইবে যে, ক্রমে ক্রমে কাম ক্রোধাদি মনের মলিনতা গুলি অপসারিত হইয়া হৃদয় এক অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; এবং ইন্দ্রিয়গণ জড়তা ও দুষ্টতা পরিহারপূর্ব্বক লঘুতার সহিত সততাপূর্ণ কার্য্য-ক্ষমতা লাভ করিতেছে। এই প্রকারে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন মানব মরধামে অমরের ন্যায় মহিয়সী শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নিত্য-ক্রিয়া

যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, নিত্য ক্রিয়া কি ?

দয়ানন্দ। প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই নিত-ক্রিয়া কহে। মানব জীবনের কর্ত্তব্য অনন্ত, অসংখ্য। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা উহা নির্দ্দেশ করা সহজ-সাধ্য নহে। অনেক সময়ে মানব ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া অকর্ত্তব্যকেও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া লয়; এবং হয়ত অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে ঐ অকর্ত্তব্য প্রসূত কুফল ভোগ করিয়া আপনাকে অবসাদগ্রস্থ করিয়া তুলে; পরন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ত্তব্যেও আনাস্থাবান হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে এমন অবস্থা প্রায় সচরাচর সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং মহামনস্বী আর্য্য-ঋষিগণের আর্য্য-জ্ঞান সম্ভূত লোকহিতকর অমৃতময়ী উপদেশবাণী "শাস্ত্র বাক্য" উপেক্ষা করিয়া, অসম্ভব বিকাশশীল বালক-বুদ্ধিবিশিষ্ট আমাদিগের (অন্ততঃ এই সমস্ত বিষয়ে) আত্মনির্ভরশীলতা অজ্ঞতার পরিচায়ক বুঝিয়া, পূজনীয় ঋষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করাই শ্রেয়স্কর, ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথে ধীরপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

ভারতবর্ষে আর্য্য-মনীষিগণ প্রণীত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বহুল প্রচার আছে। ঐ শাস্ত্র সমূহ, মানবজীবনের নিত্য-কর্ত্তব্যের উপদেশ বাণীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু উহার অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীস্থ অধ্যাত্মবাদের আকর বিশেষ। যদিও আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল; তবুও সদ্‌গুরুর উপদেশ ও কঠোর অধ্যবসায়ের অভাবে সাধারণ লোকে উহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারে না বলিয়া, সে গুলি প্রায়ই সন্ন্যাস-জীবনের উপযোগী, অথবা বর্ত্তমান সমাজ-শক্তির বিরোধভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে। ফলতঃ তাহা সত্য নহে। যাহা হউক আমরা আপাততঃ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, আর্য্য-ঋষিরা নিত্য-ক্রিয়াকে কি প্রণালীতে বিধিবদ্ধ করিয়া মানব-জীবনকে কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী লোক-হিতকামী ঋষিরা শতবর্ষব্যাপী মানব-জীবনকে স্থূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সময়োপযোগী অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনের উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ এই প্রকার যে, শিক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত শৈশবকাল মাতা পিতার ক্রোড়ে আদরে অতিবাহন করিয়া, কৌমার এবং যৌবনের প্রথমভাগ, ব্রহ্মচর্য্য নামক আশ্রমে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচর্য্যার সহিত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ যথা সাধ্য পূর্ব্বে বিবৃতি করিয়াছি। বিদ্ ধাতু ঘঞ্ করিয়া বেদ ও শাস্ + ত্র করিয়া শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জীবনোন্নতির উপযোগী যাবতীয় বিষয় জানিতে চেষ্টা করা ও

ঋষি-কথিত অনুশাসনপদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালন করিতে শিক্ষা করাই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্য বা ফল।

যোগ। জানিবার মত যাবতীয় বিষয় এক জীবনে শিক্ষা করা কি সম্ভব হয়?

দয়া। সম্ভব না হইলে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে কেন? যদিই এক জীবনে না হয়, বহু জীবনেও করিতে হইবে—জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা আত্ম-হিত-সাধন করিতে হইবে। সেই চেষ্টাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৫ অধ্যায় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অল্পদিন মাত্র গুরু কুলে বাস করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যা, কলা অর্থাৎ শিল্প-বিদ্যা, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। তুমি বলিবে তিনি ভগবান, তাহাতে সকলই সম্ভব হয়। তাহা সত্য হইলেও তিনি মানব জগতে মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া মানবোচিত চেষ্টার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

"প্রভবৌ সর্ব্ব বিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ
নান্য সিদ্ধামলং জ্ঞানং গুহমানৌ নরে হিতৈঃ।"

ভাগবত ১০।৪৫

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধন প্রভাবে অভ্যন্তরস্থ পরমাত্মারূপী চৈতন্য শক্তির মোহাবরণ বিদূরিত হইলে, মানবের প্রজ্ঞা নামক তৃতীয় চক্ষুর বিকাশ হয়। তখন মানব অনধীত

শাস্ত্রের অর্থবোধেও সমর্থ হয়। সুতরাং সে প্রকার সাধনশীল অধ্যবসায়ীর পক্ষে জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হ'ক, আমরা প্রসঙ্গাগত আলোচনায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন অদ্যকার বিবৃত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যা'ক।

দ্বিতীয় যৌবনের অপরাংশ এবং প্রৌঢ় অবস্থা লইয়া গার্হস্থ্য জীবন গঠিত করিবে। গৃহস্থ + ষ্ণ্য = গার্হস্থ্য, অর্থ = গৃহস্থ সম্বন্ধীয়। ভাবার্থ—গৃহে অবস্থান অর্থাৎ এই কালে গৃহে অবস্থিতি করিয়া মন্বাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

তৃতীয় বার্দ্ধক্যের প্রথম ভাগে বানপ্রস্থাবলম্বন করিবে। বন + প্র + স্থা + ড + ষ্ণ = বানপ্রস্থ, অর্থ = বনে প্রস্থিত অর্থাৎ বনে গমন করিয়া বাস করিবে। বানপ্রস্থী বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, অগ্নি হোত্র, দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ এবং বৈশ্বদেব-বলী অর্থাৎ বিশ্ববাসী জীবগণের হিত-সাধন ও নিরন্তর কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে।

"স্বাধ্যায় নিত্যযুক্তঃস্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্ব ভূতানুকম্পকঃ॥"

মনু ৬।৮

বানপ্রস্থী নিত্যই বেদ্যাধয়নে রত থাকিবে; শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব সহনশীল, পরোপকারী, সংযতমনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত এবং সর্ব্ব ভূতে দয়াশীল হইবে।

বার্দ্ধক্যের অপরাংশে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। সম্ + নি + অস্ + ঘঙ্ = সন্ন্যাস; অর্থ = কাম্য-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ,

ভিক্ষু ধর্ম্ম, ত্যাগ, সমর্পণ। এই কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রমের বিহিত ইষ্ট পূর্ত্তাদি স্বর্গজনক অর্থাৎ সুখ বা শান্তি হইবে, এবম্বিধ আশায় প্ররোচিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আপনার আবাস স্থল মনে করিয়া, অযাচিত প্রতিগ্রহের দ্বারা আপনার উদর পূরণ করতঃ যথেচ্ছা ভ্রমণ পূর্ব্বক মোক্ষ সাধন করিবে। ইহা মন্বাদি শাস্ত্রের অভিমত, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান কহিয়াছেন ;—

> "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মং করোতি যঃ।
> স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ ॥"
>
> গীতা ৬।১।

'ইষ্ট পূর্ত্তাদি অথবা যে কোন কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হইবে না। যিনি কর্ম্ম করেন, কিন্তু ফলের আশা করেন না, তিনিই সন্ন্যাসীও বটে যোগীও বটে।'

ফল কথা এই যে, অনভিভূত, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিস্পৃহ, নির্লোভ, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা ও স্বার্থগত চিন্তায় অভিনিবেশ শূন্য হইয়া, ফলাফলে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বিশ্ববাসী জীব সমূহকে বিশ্বনাথের প্রতীক স্বরূপ চিন্তা করিয়া, বিশ্বের হিত-চিন্তায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া, এক নিত্যানন্দ ভাব-বিগ্রহের ন্যায় যথেচ্ছা পরিভ্রমণ করিবে।

ভাল বা মন্দ যাহাই হ'ক, ফল প্রকাশ করিতে কর্ম্মের অদমনীয় শক্তি আছে ; এবং সেই ফল কর্ম্মীকে উপভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং সন্ন্যাস জীবন মানব জীবনের পূর্ব্ব

ভাগে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম সমূহের ফলস্বরূপ এক অনন্ত অসীম আনন্দ-সমুদ্রে ভাসমান হইবার—উপভোগ করিবার ক্ষেত্রেই মানুষকে লইয়া যায়।

জীব জন্মিয়া মরে, মরিয়া জন্মে। গরম হইলে ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা হইলে গরম হয়। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিকূল ভাবপ্রবণ, ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে জগৎ বাঁচিয়া রহিয়াছে, আবহমান কাল হইতে এই ভাব বিপর্য্যয়ই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই চিরবিপর্য্যয় ভাবের বিরাম নাই, যে দিকে তাকাইবে—দেখিবে একটী ভাব আর একটীর বিরোধী, একটী অপরটীকে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। আবার একটী—আবার একটী, এমন করিয়া এই বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত অসংখ্য ভাব-স্রোতের উজান ভাঁটী চলিতেছে; এবং এই বৈপরিত্যই যেন প্রকৃতি দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। সন্ন্যাস জীবনে এই ভাবের সমন্বয় হয়, বিশ্বসাম্রাজ্য এক নূতন আকার ধারণ করে; বৈপরিত্য এখান হইতে দূরে পলায়ন করে। সন্ন্যাস জীবনে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যক্তিগত ভাব বিদূরিত হইয়া বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত অসীম অখণ্ড আকার ধারণ করে। এখানে কর্ম্মের শক্তি, জ্ঞানের আলোক, ভক্তির ভাব যুগপৎ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এ জীবনে কিছুর অভাব নাই, কিছু চাহিবার নাই। এ জীবন চির-পরিতৃপ্ত, চিরপ্রসন্ন, চিদানন্দ ভাব বিশিষ্ট ইহাই মানব জীবনের চরম উন্নতি।

চারি ভাগে বিভক্ত মানব জীবন ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন দ্বারা

অসীম অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রবর্ত্তী হইবে এবং একদিন জীব, শিবত্ব লাভ করিবে যে প্রকারে, মহামনস্বী ঋষিগণ আশ্রম-ধর্ম্ম বিধানদ্বারা, তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, কালে এই ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের অস্তিত্ব মাত্র অবশিষ্ট রহিবে। সুতরাং তৎকালেও যাহাতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ না হয়, ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস জীবনের সাধন সাপেক্ষ কর্ম্মগুলি, স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে গৃহস্থগণের নিত্যক্রিয়ারূপে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই বিধান করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থোচিত নিত্য-ক্রিয়া সমাধান দ্বারা অভীপ্সিত উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত হইবে না। গৃহস্থ জীবনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের সমন্বিত ভাব ও শক্তি প্রস্ফুট হইবে।

বর্ত্তমান ভারতে আশ্রম-ধর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া মানব উন্নতির আশা পরিহার করে নাই, করিতেও পারে না। উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় আর্য্য-মহাত্মাগণের হীনশক্তি বংশধরগণ আজ পৃথিবীর যে দিকে চাহে, অতুল ঐশ্বর্য্যের অত্যুজ্জ্বল চাক-চিক্যে নয়ন ঝলসিয়া আইসে, শিল্প বিজ্ঞানের অমানুষিক আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়, স্বাস্থ্যবানের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া বিস্মিত হয়, আর তাহাদের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয় আত্মগ্লানির প্রতপ্ত অনলে পুড়িয়া ক্ষার হইতে থাকে। যাহার প্রাণে সজীবতা আছে, সে নিস্তব্ধ-নিশীথে নীরব-অশ্রুরাশির দ্বারা সে অনল-শিখা নির্ব্বাপণ করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে

হতাশার উত্তপ্ত নিশ্বাসের সহিত নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। ক্রমে প্রত্যুষে মায়াবিনী আশা কুহকিনী তাহার কর্ণমূলে ধীরে ধীরে কহিতে থাকে,—

আর ঘুমাইওনা দেখ চক্ষু মেলি
ঊষার আলোকে জগৎ উজলি
প্রকৃতি সুন্দরী ভরিয়া অঞ্জলি
  আনন্দের ধারা ছড়ায়ে যায়।
কোলাহল করি সকলে মিলিয়া
লইছে কুড়ায়ে অঞ্চল ভরিয়া
নিস্তব্ধ নীরবে অসাড়ে পড়িয়া
  হীন যারা তারা ঘুমায়ে রয়॥

উঠ যোগজীবন! উঠ—আর ঘুমাইওনা। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, যাহাদের চাকচিক্য দেখিয়া তোমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তাহারা অদম্য অধ্যবসায়—প্রাণপণ কঠোর সাধনার ফল প্রভাবে উহা লাভ করিয়াছে। তোমরা সাধকের জাতি, সাধকের সন্তান, তোমরা সাধনা ভুলিয়া হীন হইয়াছ। আর ঘুমাইও না,—আর ভুলিও না। ঐ প্রভাতে—যে প্রভাতে প্রশান্ত ললাটে সিন্দুর-শোভিনী সীমন্তিনীর ন্যায় সুরসুন্দরী ঊষাদেবী নবোদিত তরুণ তপনের স্নিগ্ধ কিরণে জগতে নবীন জীবন ঢালিয়া দিতেছেন, যে প্রভাতে—প্রকৃতি দেবী, মন্দ-মারুতান্দোলিত কিশোর কিশলয়ের অন্তরালস্থ পিককুলের কলধ্বনিতে জীবন্তের সাড়া দিয়া নিদ্রালস নির্জীব জগৎকে জাগাইয়া তুলিতেছেন; ঐ প্রভাতে জাগ যোগজীবন!

জাগাও তোমার সোদর সদৃশ স্বদেশবাসিগণকে, জাগিয়া সকলে মিলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃপুরুষ আর্য্য-ঋষিগণের কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের অনুজ্ঞানুসারে প্রভাতের প্রথম জীবনে কর্ম্মময়ী মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া মুক্তির হেতু মুখ্যসাধনে অগ্রসর হও।
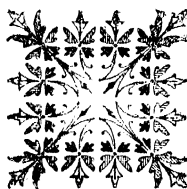
ষোড়শ অধ্যায়।

নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমস্তর

প্রাতঃ-কৃত্য।

যখন প্রকৃতি দেবী পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভাত সঙ্গীত গাহিতে থাকেন, এবং সেই সঙ্গীতের স্বর লহরীতে নিদ্রালস নির্জ্জীবপ্রায় জীব-জগৎ যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহে নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করে, সেই সময় হইতে যম, নিয়মের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক নিত্য-ক্রিয়ার প্রথম স্তরে মনোভিনিবেশ করিতে হয়।

যোগ। যম, নিয়ম কি?

দয়া। যোগ ও ভক্তি বর্ণনকালে উহা আমি তোমাকে বিস্তারিত বিবৃতি করিব। আপাততঃ বুঝিয়া রাখ যে, যম অর্থ সর্ব্বোতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম; নিয়ম অর্থ নির্দ্দিষ্টরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা।

যোগ। ভাল, নিত্য-ক্রিয়ার প্রথম স্তরে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-পদ্ধতি বিবৃতি করুন।

দয়া। শাস্ত্র, জীবনের প্রথম ভাগে (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে) শৌচাচার সমন্বিত শিষ্য, গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদি আহরণ, গুরুর পরিচর্য্যা ও বেদাধ্যয়ন করিবেন বলিয়া বিধান করিয়াছেন। তদনুরূপ দৈনিক জীবনের প্রথমভাগে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক চক্ষু চাহিয়া সংসার দেখিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণ করিয়া, এবং আপনার কর্ম্ম-জীবনে তদনুরূপ সামর্থ্য লাভের প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থান করিবে। পরে নিদ্রালস দেহের জড়তা দূর ও স্বাস্থ্য সম্বিধানের জন্য মল মুত্রাদি পরিত্যাগ করিবে, এবং শৌচার্থ অবগাহন পূর্ব্বক অথবা সুযোগ ও সুবিধা মতে প্রাতঃস্নান করিয়া গুরূপদিষ্ট মতে আচমন করতঃ আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিবে। পরে যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপিত করে, তদ্রূপ পবিত্র ও শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিধেয় বসনের নিম্নে কৌপীন (ল্যাঙ্গট) পরিধান করা উত্তম। উহাতে শরীরকে সবল, সুদৃঢ় ও কর্ম্ম-ক্ষম রাখে এবং ঐন্দ্রিক উত্তেজনা ও ধাতু বিকৃতি নিবারণ করে। তৎপরে সন্ধ্যা পূজার জন্য বারি ও পত্র*পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবে, এবং দেবতাগৃহে অথবা যে কোন নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন পবিত্র স্থানে আসন গ্রহণপূর্ব্বক গুরূপদিষ্টমতে সন্ধ্যা পূজা অথবা উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং উক্ত আশ্রমের গুরু পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে দীক্ষাদাতা

---

*তুলসীপত্র বিল্বপত্র ইত্যাদি।

গুরুর পরিচর্য্যা করিবে, যাহার গুরু লোকান্তরিত হইয়াছেন, অথবা অন্য কোন কারণে গুরু পরিচর্য্যার সুবিধা নাই, তিনি তৎপরিবর্ত্তে জগৎগুরু জ্ঞান-দেবতা শ্রীভগবানের প্রতি মূর্ত্ত্যাদির পূজা অর্চ্চনা করিবেন। যাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিমূর্ত্ত্যাদির পূজার্চ্চনার সুযোগ সুবিধা নাই, তিনি পটময় (ছবি) মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কিংবা ধ্যান-যোগে শ্রীভগবানের প্রতিচ্ছবি সম্মুখীন বা হৃদয়স্থ করতঃ ধারণা যোগে তাহাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিবেন।

যোগ। মূর্ত্তি পূজার কি মৌলিকতা আছে? আধুনিক শিক্ষিতেরা ওটাকে সঙ্গত বা প্রয়োজন বোধ করেন না।

দয়া। আছে বৈ কি! তুমি কি মনে করিয়াছ যে, মূর্ত্তি বা প্রতিমা স্বকপোল কল্পিত? তাহা নহে। বেদ বা দর্শন শাস্ত্রাদিতে যে নির্বিবশেষে ব্রহ্ম-চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা এত উচ্চ স্তরের কথা যে, সাধারণের ধারণার অতীত। সুতরাং প্রতীক ব্যতীত ভগবানের ভাব ধারণা করা সম্ভব নহে। বৈদিক যুগেও জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমি প্রভৃতিকে ভগবানের প্রতীক স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। বেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসমূহ সমধিক সরলভাবে প্রস্ফুট করিবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব, এবং দর্শন শাস্ত্রের বর্ণিত ভাব গুলিকে আরও সমধিক স্থূলভাবে প্রস্ফুট করিবার জন্য পুরাণাদির প্রচার হইয়াছে। আমরা এই পুরাণ শাস্ত্রেই ভগবানের প্রতীক বা প্রতিমূর্ত্তির অধিক আলোচনা দেখিতে পাই। তাহার কারণ এই যে, বহুকার্য্যপরতন্ত্র স্থূলবুদ্ধি আমাদের সহজে অধিগম্য হইবার

জন্য, পুরাণ-শাস্ত্রকর্ত্তারা উহার বিস্তারিত বিবৃতি করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, প্রতীকাদির ব্যবহার এত পুরাতন যে, কখন কে উহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অনুমানের অতীত ; এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর যে কোন শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে উহার ব্যবহার আছে। যাঁহারা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, তাহারাই প্রতীক বা প্রতিমূর্ত্তির ব্যবহার সঙ্গত মনে করেন না। তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক যে, কোন প্রতি-মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলে, প্রাণে কেমন একটা পবিত্র ভাব জাগরূক হইয়া থাকে ; উহা মূর্ত্তির স্বাভাবিক শক্তি। কেহ মূর্ত্তিকে ঐ শক্তি প্রদান করেনাই। সুতরাং যাঁহারা প্রতি-দিন প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া ভক্তি ভরে অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারা ঐ মূর্ত্তি হইতে পবিত্র শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনার হৃদয়কে পবিত্রতার আগার করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। ধাতু প্রস্তর নির্ম্মিতই হউক বা পটময়ই হউক, পবিত্রভাববিশিষ্ট মূর্ত্তির দ্বারা প্রাণে অত্যন্ত পবিত্রভাব জাগরূক হয়। সুতরাং পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির প্রতি বিশেষ রূপে ভক্তি প্রদর্শন করিবে।

যোগ। মূর্ত্তি পূজার বিনিময়ে ধ্যানের আবশ্যক ; নহে কি ?

দয়া। নহে। মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা ধ্যান উচ্চস্তরের উপাসনা। ধ্যান মূর্ত্তিপূজার ফল। মূর্ত্তিপূজার ফলে হৃদয়ে যে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহার ফলে ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয় ও ধ্যানের শক্তি জন্মে।

যোগ। ধ্যানের ফল কি ?

দয়া। যোগের বা সাধনার চরম ফল সমাধি ধ্যান, তাহার মূলভিত্তি। ধ্যান-যোগ অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমাধি লাভের চেষ্টা করিতে হয়। যে প্রকার বিষয়ের চিন্তা করা যায়, হৃদয়ে তদনুরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছার ফলে চেষ্টা, এবং চেষ্টার ফলে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। আপনাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করিলে, নিরন্তর পবিত্র বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহারই ফলে মন ও ইন্দ্রিয় পবিত্রতম কর্ম্মের উদ্যোগী হইবে। ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। চিন্তা ধারাবাহিক রূপে দীর্ঘকাল পরিচালিত হইলে ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। কিছুদিন ধ্যান অভ্যাস করিলে, তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যোগশাস্ত্র এবং আধুনিক কতিপয় ঘটনার দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে; উৎকট ধ্যানের প্রভাবে ধ্যান যোগী বা সাধক, ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হইতে পারেন। তেলাপোকা কুমীরকা পোকার নিকটবর্ত্তী হইলে স্বভাব বশে ধ্যানযোগীর ন্যায় (ইন্দ্রিয় হীন মৃতের মত অবশ ভাবে) উহার দিকে তাকাইয়া থাকে; পরে সেই নিশ্চঞ্চল দৃষ্টিও থাকেনা। এমত অবস্থায় ঐ তৈলপায়িকা কুমীরকার বাসায় কিছুদিন অবস্থানের পর তদাকার প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহা প্রত্যক্ষ গোচর করা হইয়াছে। ধ্যেয় বস্তুর আকারে জীবন্ত দেহের পরিবর্ত্তন যখন সম্ভব হয়, তখন ধ্যেয় বস্তুর ভাবে প্রাণের ভাবটা পরিবর্ত্তিত হওয়া খুব সম্ভব ও সহজ সাধ্য নহে কি ?

ধ্যান বলিলেই কোন দেব-চরিত্রের চিন্তা করা বুঝা যায়। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গুণ সম্মিলনের আনুপাতিক অবস্থানুসারে চরিত্র গঠিত হয়। দেব চরিত্রে ও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই; অর্থাৎ কোন দেবতার চরিত্র রজো মিশ্রিত সত্ত্বগুণ প্রধান, কাহার ও সত্ত্ব মিশ্রিত রজোগুণ প্রধান। ধ্যেয় চরিত্রই প্রকৃত আদর্শ, এবং আদর্শ চরিত্রের গুণানুসারেই ধ্যান যোগীর পরিণাম পরিণতি হয়। সুতরাং যে চরিত্র চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের ভাব সমন্বয় হইয়া যে চরিত্র চিরপূর্ণতর রূপে প্রস্ফুট হইয়াছে; সেই পবিত্র চরিত্রের প্রতিচ্ছবি সম্মুখে বা হৃদয়ে রাখিয়া এবং তদীয় কর্ম্ম মালা ও ভাবরাশী নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় নিরন্তর অনু-স্মরণ দ্বারা আপনাকে অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রবর্ত্তী করিতে প্রয়াস পাইবে। এই পন্থাই তোমাকে অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে।

যোগ। মন্ত্র জপের আবশ্যকতা কি?

দয়া। ধ্যানের প্রথমাবস্থায় মন্ত্রই ধ্যানের উত্তেজক শক্তি। কয়েকটী বর্ণের সমষ্টি একটী শব্দ, এবং কয়েকটী শব্দের সমষ্টি একটী মন্ত্র। অবিতর্কিত ভাবে মনের উপর ক্রিয়া প্রদর্শন করা শব্দের স্বাভাবিক শক্তি। তুমি সহজেই বুঝিতে পার যে, তোমাকে কেহ কটুক্তি করিলে বিচার করিবার পূর্ব্বেই তোমার ক্রোধ বা বিরক্তির উদ্ভব হয়। তদ্রুপ কেহ প্রশংসা করিলে আনন্দের উদ্রেক হয়। এই স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি শব্দের মধ্যে অনাদিকাল হইতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং শব্দ-সম্ভূত

মন্ত্র ঐ প্রকার শক্তিপ্রভাবে মনের উপরে অবিতর্কিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য করে। মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে সেই ক্রিয়া প্রবলবেগ সম্পন্ন হয়।

তুমি বোধ হয় জান যে, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান প্রভৃতি প্রধান পাঁচটী এবং সাধারণতঃ ঊনপঞ্চাশটী বায়ু শরীরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিতেছে; এবং এক একটী শব্দ উচ্চারণ কালে বিভিন্ন বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ হইতেছে। শব্দ উচ্চারণ কালে বিভিন্ন বায়ুর বিভিন্ন ক্রিয়া হয়। এই সমস্ত বায়ুর ক্রিয়াই মনের উপর কার্য্য করে। কোন বায়ুর কি প্রকার ক্রিয়া মনে কিরূপ ভাব উদ্ভাবন করে, তাহা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই বর্ণ বিশেষ সংযোজনা করিয়া মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং বিভিন্ন প্রকার মানসিক ভাব গঠনের জন্য, বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।* সিদ্ধ সাধকেরা তাহা স্পষ্টতর প্রমাণ করিয়াছেন। ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্যদেব" উপদেশ করিতেন যে, "কৃষ্ণমন্ত্র" জপ কর, পাষণ্ডেরও প্রেম-ভক্তির উদয় হইবে।" বিজাদি সংবলিত সিদ্ধমন্ত্র কেন, "হরেকৃষ্ণ" নাম অধিক সংখ্যা জপ করিলে যে পাষণ্ডেরও ভক্তির উদ্রেক

---

* যোগ ও ভক্তি নামক গ্রন্থে শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে জানিবার মত গুঢ়-রহস্যবিশিষ্ট অনেক বিষয় প্রকাশ হইবে।

হয়, হৃদয় পবিত্র হয়—নির্ম্মলতা লাভ করে, তাহা অনেক হতভাগ্য পরীক্ষা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

মনের ধারাবাহিক শক্তি (Will force) মন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়াই মন্ত্র ধ্যানের অত্যন্ত সহায়তা করে। শব্দের দ্বারা মনের শক্তি সমধিক উদ্রিক্ত হয়, তাহা পাশ্চাত্য সাধকেরাও স্বীকার করেন। সুতরাং মনের ভাব ও শক্তি গঠনে মন্ত্র-শক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তর্কস্থলে এ সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও প্রকৃত কথা এই যে, শব্দ বা শব্দোৎপন্ন মন্ত্র অনাদি, স্বয়ম্ভূব; কেহ আবিষ্কার করে নাই।

প্রকৃতি যেমন প্রকৃতিকে বুঝিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রবেশ নিয়মনাদি বিলাসযুক্ত (লক্ষণযুক্ত) জগৎকারণ শ্রীভগবান প্রকৃতির মধ্যদিয়া আপনাকে আকাশ, বায়ু, বহ্নি, বারি, ভূমি, তরু, লতা, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী; নর, নারী প্রভৃতিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া, বিশ্ববাসী নরনারিগণকে, বিশ্বব্যাপী আপনার তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য, বীজসংবলিত মন্ত্ররূপ প্রতীকের দ্বারা জগৎ সমক্ষে আপনাকে চির-আবির্ভূত রাখিয়াছেন। * ঐ মন্ত্র সমূহই বেদের বেদত্ব, এবং তন্ত্রাদির সারগর্ভ গুঢ় রহস্য। যেমন স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর স্রোত বাহিয়া নীলাম্বুনিধির উদ্দেশ্যে গমন করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবানের

* বীজ সংবলিত যে মহামন্ত্রে এই গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

প্রতীকস্বরূপ শব্দ-ব্রহ্ম মন্ত্রাদির আশ্রয় লইয়া ক্রমে ক্রমে ধ্যানও সমাধির মধ্যদিয়া অনন্ত—অসীম ভগবদ্ভাব-সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হয়।

বহিঃপূজার জন্য মৃৎ প্রস্তরাদি বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, মানস পূজার জন্য ধ্যানময় মূর্ত্তি, এবং জপের জন্য মন্ত্র, এই সকলই শ্রীভগবানের প্রতীকস্বরূপ। প্রতীকের সাহায্য ব্যতীত উপাসকের জন্য অন্য কোন সরল পন্থা অত্যন্ত বিরল। মন্ত্রজপ, মূর্ত্তি-পূজা কিংবা নাম-গান ধ্যানের অত্যন্ত সহায়তা করে। অজ্ঞের ন্যায় মন্ত্রজপ করিতে করিতে ধ্যানের শক্তি জাগিয়া উঠে। ধ্যানকালে মন্ত্রজপ করিতে করিতে ধ্যানের প্রগাঢ়তা অর্থাৎ তন্ময়তা বা সমাধি উপস্থিত হয়, এবং তাহারই ফলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

যোগ। তৎপরে আর কি কর্ত্তব্য তাহাই বিবৃতি করুন।

দয়া। ধ্যান, ধারণা, জপাদি কার্য্য অন্তে বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অধুনা উহা সহজ সাধ্য নহে বলিয়া সমস্ত বেদের চরম লক্ষ্যস্থল উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তন জন্য স্তব, সৎশাস্ত্র,* উত্তম চরিত্র ও ভগবদ্ভক্তগণের ইতিহাসাদি অধ্যয়ন করিবে ও শ্রবণ করিবে।

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান সাত্বতাং পতিঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ।"

ভাগবত ১।২।১৪

---

* গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি।

'অতএব একাগ্রমনে সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানকে নিত্য পূজা করিবে, ধ্যান করিবে, এবং তদীয় গুণমালা কীর্ত্তন করিবে ও শ্রবণ করিবে।'

এই প্রকারে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবৎ সেবা, পূজা, কীর্ত্তন, শ্রবণাদির দ্বারা প্রাতঃকৃত্য সম্পাদিত হইলে, হৃদয়স্থ অশুভাচারী বাসনা সমূহ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল-স্বরূপ ভগবান উত্তম শ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইবে; এবং তাহাতেই তোমার সমস্ত দিনের কর্ম্ম-জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ-হীন বিশুদ্ধ সত্বসম্ভব প্রসন্নতা লাভ করিবে।

"নষ্ট প্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়াঃ
ভগবতুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদারজস্তমো ভাবাঃ কাম লোভাদয়শ্চ যে
চেত এতৈরণাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥"

ভাগবৎ ১।২।১৮—১৯॥

যোগ। ধ্যান, ধারণা, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতির কোন প্রণালী আছে? কিম্বা আপনার ইচ্ছামত করিলেই হইবে।

দয়া। সংসারের সকল কার্য্যেরই এক একটী প্রণালী আছে, এবং তাহা কাহারও না কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয়; আর মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে যাহার দ্বারা, তাহার প্রণালী শিক্ষার আবশ্যক নাই, একথা বলিলে মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়।

যোগ। কি প্রকারে শিখিতে হইবে?

দয়া। আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তবে গুরুটী ভাল হওয়া চাহি। কারণ গুরু শিক্ষার প্রণালী উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না থাকিলে, কি শিক্ষা দিবেন? বর্ত্তমান দেশে যেমন শিক্ষালিপ্সু অধ্যবসায়ী শিষ্যের অভাব, তেমনি গুরুরও অভাব হইয়াছে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েরই অভাব হইয়া দেশ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

যোগ। গুরুর ভাল মন্দ কি প্রকারে বুঝিব?

দয়া। উহা এখন আলোচনা করার আবশ্যক নাই। পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অদ্য চল আশ্রমে যাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিত্য-ক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর।

মধ্যাহ্ন-কৃত্য।

যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবনের দ্বিতীয় অংশ গার্হস্থ্যজীবনের কর্ম্ম পদ্ধতির সহিত দিন-চর্য্যার কোন অংশের কি প্রকার সংশ্রব আছে তাহাই বলুন।

দয়ানন্দ। জীবনের মধ্যভাগে আচরিত গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যগুলি দৈনিক কর্ম্ম-জীবনের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন-কৃত্যের দ্বারা প্রস্ফুট করিতে হইবে। গৃহস্থ-জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য এই যে, পরিবারবর্গ, আশ্রিত, গৃহপালিত পশু বা পক্ষীকে যত্নের সহিত ভরণ পোষণ; দেবলোক, পিতৃলোক ও অতিথির তৃপ্তি সাধন করিবে; এবং ধর্ম্মের অবিরোধীভাবে অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যা, অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করিবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥"

'ধীমান গৃহী অজর অমরের ন্যায় বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করিবেন, এবং মৃত্যু কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিবেন।'

দৈনিক কর্ম্ম-জীবনের মধ্যভাগে পঞ্চ যজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। তাঁহার রহস্য এই যে, উপকার ও অর্চ্চনার দ্বারা মানব ও দেবতার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া আপনাকে অপবিত্রতা ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে বাহির করতঃ পবিত্ররূপে সম্প্রসারিত করিবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহাকে প্রপীড়ন করিলে, অথবা কাহারও প্রয়োজনে অকাতরে স্বার্থ-ত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে অনুতপ্ত বোধ করিবে; এবং প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিবে। শাস্ত্র ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চশুনা অর্থাৎ চুল্লী, সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) উদুখল, (যাহাতে ধান্যাদির তুষ ছাড়ান হয়) বারিকুম্ভ (জলের কলস) এবং জাঁতা প্রভৃতির ব্যবহারে যে ব্রহ্মের অংশে সঞ্জাত কীটাদির বিনাশ হয়, অথবা অন্য যে কোন প্রকারে অকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম জনিত পাপ হয়, তাহা দূর করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পঞ্চ যজ্ঞ অর্থাৎ—বেদাদি অধ্যয়ন অথবা জপাদির দ্বারা ব্রহ্ম-যজ্ঞ করিবে। পিতৃ-লোকের পরিতৃপ্তির জন্য উদকাদি তর্পণ দ্বারা পিতৃ-যজ্ঞ করিবে। হোম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত অগ্নিতে ঘৃতাদি আহুতির দ্বারা দেবতাগণের সন্তোষ বিধানের জন্য দেব-যজ্ঞ করিবে। বলি অর্থাৎ আহার্য্যাদি অর্পণ করিয়া পশু পক্ষ্যাদি ভূত সমূহের এবং সেবা ও শুশ্রূষার দ্বারা অতিথির পূজা করতঃ ভূত-যজ্ঞ ও নর-যজ্ঞ সমাধান করিবে।

মনু বলিয়াছেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্ম-যজ্ঞ পিতৃ-যজ্ঞস্তুতর্পণম্
হোমে দৈবো বলির্ভৌতে নৃ-যজ্ঞোঽতিথি পূজনম্ ॥"

মনু—৩।৭০

এই বিধানগুলি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মনু আরও বলিয়াছেন,—

"দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চযঃ
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্সন্ স নজীবতি ॥"

মনু—৩ ৭২

'যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, আশ্রিত, আজ্ঞাবহ, মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গ, পিতৃগণের ও ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার সন্তোষ বিধান করে না, সে মৃত তুল্য ; তাহার উন্নতি কোথায় ?

মধ্যাহ্ন-কৃত্য ও তাহার উদ্দেশ্য এই যাহা বিবৃতি করা হইল, তাহা কি প্রণালীতে সম্পাদন করিতে পারা যায়, এখন তাহার আলোচনা করা যাক।

চারিদণ্ড বেলার পর হইতে দ্বাদশ দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন-কৃত্যের সময়। এই কালে গুরূপদিষ্ট মতে প্রথমে উদকাদির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। পরে বেদাদি অধ্যয়ন, অথবা ইষ্ট-মন্ত্রাদি জপ করিবে। যাঁহাদিগের মধ্যাহ্নকালে এই তর্পণ, অধ্যয়ন বা জপাদি করিবার অসুবিধা হইবে, তাঁহারা ইহা প্রাতঃ-কৃত্যের সহিত একত্রে (অর্থাৎ এক সময়ে অথচ পর পর) করিতে পারেন। তৎপর গৃহপালিত গবাদি পশু ও পক্ষিগণের, এবং আশ্রিত ভৃত্য ও পরিজনবর্গের আহারাচ্ছা-

দনের ব্যবস্থা সাধ্যমতে করিবে। পরে সমাগত অতিথির, যথাসাধ্য সেবা ও শুশ্রূষা করিবে; এবং সর্ব্বশেষে পবিত্র আহার্য্যাদি, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, ঐ উৎসর্গীকৃত অন্নাদি দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে, আপনি প্রসন্নচিত্তে আহার করিয়া আচমন করিবে।

ব্রহ্ম-যজ্ঞ এবং পিতৃ-যজ্ঞের পরেই, আহুতির দ্বারা দেব-যজ্ঞ করা উচিত। কিন্তু অধুনা অগ্নি প্রতিষ্ঠার প্রথা নাই; এবং ঘৃতাদির স্বচ্ছলতা না থাকায়, হোমাদির দ্বারা দৈবোযজ্ঞ সমাধা করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া, অন্নাদি উৎসর্গের দ্বারা দৈবাযজ্ঞ সম্পাদন করা সুবিধাজনক। অতএব ভূত-যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের পরে, আহারের পূর্ব্বে, উহার আয়োজন করা অসঙ্গত নহে। বলাবাহুল্য যে, দেবোদ্দেশ্যে আহার্য্যাদি অর্পণ না করিয়া, কথনই উদর পূরণের জন্য আহার করিবে না।

যোগ। ধ্যান ও জপ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যখন দেবতার প্রীতি উৎপাদন করা যায়, তখন আবার আহুতি বা আহার্য্যাদি উৎসর্গের আবশ্যক কি? বিশেষতঃ মনুষ্যপ্রদত্ত আহার্য্যাদি দেবগণ কি প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহাত কিছুই বুঝি না।

দয়া। জপ ও ধ্যানের ফলে উপাস্য উপাসকের মধ্যে মনঃশক্তি তাড়িত প্রবাহের ন্যায় পরিচালিত হয়। সেই হেতু ধ্যানের প্রভাবে মনের শক্তি, দৈবশক্তিকে আলোড়ন এবং আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পায়। তাহার ফলে (ধ্যান ধারণা সুদৃঢ় হইলে) দৈবশক্তি মানবমনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। সমর্থবান সাধকের পক্ষে ইহা এত স্পষ্টরূপে সম্পন্ন হয় যে, সাধক

তাহা অনুভব করিতে পারিয়া, অসীম আনন্দে বিহ্বল হইতে থাকেন। আহার্য্যাদি উৎসর্গের দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ প্রকার ফলই উৎপাদন করে। কারণ উৎসর্গ কার্য্যের দ্বারা গৌণ ভাবে ধ্যানের কার্য্যই হয়।

দেবগণ সূক্ষ্ম শরীরী, কিন্তু তাঁহাদিগের আহারের আবশ্যক আছে। তাই তাঁহারা মানবপ্রদত্ত আহারের অভ্যন্তরস্থ জল, বায়ু, তাপাদির সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া, প্রতিদান স্বরূপে, সূক্ষ্ম-শক্তি সমূহকে, অপেক্ষাকৃত স্থূলাকারে জগৎরাজ্যে বিতরণ করেন। অর্থাৎ বৃষ্টিরূপে জল, রৌদ্ররূপে তেজ, ভূমিরূপে ক্ষিতি, জ্যোৎস্নারূপে ওষধিগণের অমৃতময়ী সঞ্জবনী শক্তি, বহমানরূপে বায়ু ইত্যাদি দৈবশক্তির দ্বারা, আমাদিগের অভিপ্রেত ভোগ্য বস্তু সমূহ সৃজিত হয়। ঐ প্রকারে দেব-প্রদত্ত আহার্য্যাদি, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করিয়া নিজে গ্রহণ করিলে, তাহাকে তস্কর বলা যায়। শ্রীভগবান গীতা বর্ণনকালে অর্জ্জুনকে ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন।

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।"

গীতা। ৩। ১২।

'যে ব্যক্তি দৈবযজ্ঞাদি বিস্মৃত হইয়া আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত করে এবং আহার করে, সে পাপ ভোজন করে।'

"যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা ৩। ১৩।

যোগ। যে দেশে এই প্রকারে দেবোদ্দেশ্যে আহার্য্যাদি উৎসর্গের ব্যবস্থা নাই, সে দেশে কি শস্যাদি উৎপন্ন হয় না?

দয়া। তুমি যে এই প্রশ্ন করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি। হয়, কিন্তু অভাব ও অশান্তির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দাও, এইদেশ দিয়া বুঝিয়া দেখ। ভারতের পুরাতন ইতিহাসে, অর্থাৎ যখন দেশে উক্ত প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি পরিচালিত ছিল, তখন কতদিন অনাবৃষ্টি, অতিরৌদ্র, দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে? এখনই বা কি প্রকার শুন, তাহাই একবার চিন্তাকর।

যোগ। আহার্য্য আপন আপন রুচি অনুসারে হওয়া উচিত নহে কি?

দয়া। না, কারণ যদিও শরীর পোষণের জন্য আহারের আবশ্যক, তবুও শরীরের ন্যায় মনের সহিতও আহারের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আহারের দ্বারাই শারীরিক শক্তি ও মনের ভাব গঠিত হয়। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু, এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকা কণার মধ্যেও সত্বাদি গুণ সমূহের শক্তির বিকাশ হইতেছে। যে বস্তুর মধ্যে যে গুণের প্রবলতা আছে, সেই বস্তু আহার অথবা ব্যবহারের ফলে, সেই সেই বস্তুর গুণানুরূপে মনোভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমাদিগের অতিশয় চঞ্চল মনোময়রাজ্য, এবং তদুপরিস্থ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি কামনা করিলে, যাহাতে শরীরস্থ স্নায়ুগুলি উত্তেজিত না হয় এবং মন সাতিশয়

প্রশান্তভাব ধারণ করে, তদনুরূপ চেষ্টা করিতে হইবে; এবং তাহার জন্যই আহার্য্যাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। অধুনা আমাদের দেশে কতকগুলি আহার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত ব্যবহার করা হইতেছে। সেগুলি শারীরিক শক্তির কথঞ্চিৎ সহায়ক হইলেও, মানসিক পবিত্র শক্তিকে চিরদিনের জন্য অপহরণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে অনুভব করা যাইতেছে যে, সংযমাদি মানসিক শক্তির অভাব প্রযুক্ত অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আহার্য্যাদি এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য যে, যাহার বলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয়।

শক্তি ও স্বাস্থ্য অধিক হইবে বলিয়া, কেহ কেহ অত্যন্ত রজোগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আহার করা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন। তাহারা বলেন, কর্ম্ম-জীবনে কর্ম্ম-শক্তি উদ্বোধিত করিতে হইলে রাজোগুণ উদ্দীপিত করা আবশ্যক। সেটী অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণা। কারণ কেবল রজোগুণই চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ, এবং রজোগুণ প্রধান চঞ্চলচিত্তেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি অশেষবিধ উপদ্রবের আবির্ভাব হইয়া কর্ম্ম-জীবনের মৌলিক শক্তি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। অধিকন্তু এই প্রকার অবস্থায় সমধিক যত্ন সহকারে রজোগুণাত্মক বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার কারণ এই যে, সমান গুণবিশিষ্টকে আকর্ষণ করা প্রকৃতির নিয়ম। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ॥"

'যাহা অতি কটু, অতিতিক্ত, অতিঅম্ল, অতিলবণাক্ত, অতি রুক্ষ এবং অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) তাহা দুঃখ শোক, ও রোগপ্রদ আহার, কিন্তু রাজসিকগণের প্রিয়।

যোগ। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত আহার্য্য ব্যবহার করি, তাহার মধ্যে কোনগুলি রাজসিক আহার ?

দয়া। যাহা বলিলাম তাহা ব্যতীত মদ্য, মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, কর্কট, পেয়াজ, লশুন, গাঁজর, গরম মসল্লা। (দারুচিনি, এলাচী, জৈত্রী, জায়ফল, ইত্যাদি।)

যোগ। বড় বড় ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব অত্যন্ত শক্তিশালী, পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, মৎস্য আহার ত্যাগ করিলে, মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ ফস্‌ফরাসের অভাব হওয়ায়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া চক্ষুরোগ প্রভৃতি নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির আবির্ভাব করে। বিশেষতঃ অনেকের রুচি এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যে, মৎস্য ব্যতীত তাঁহাদের আহারে রুচি হয় না। পিতামহের কাল হইতে পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ মৎস্য আহার করিতে করিতে, চাউলের ন্যায় মৎস্যও আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিলে, শক্তি ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা, তাহাও অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়।

দয়া। জীবহত্যা করিয়া সংযম ও পবিত্রতা নাশক রাজসিক আহার সংগ্রহ করা অপেক্ষা ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। মস্তিষ্ক সতেজ রাখিবার জন্য ফস্‌ফরাস্‌ অথবা অন্য তেমন যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিরামিষ আহার হইতে সংগ্রহ হইতে পারে; এবং তাঁহাতে শক্তিও স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকা অসম্ভব নহে। তবে যাহারা তোমার কথিত মতে রুচির দায়ে পড়িয়াছেন; তাঁহারা রোহিত, রাজীব, (বৃহৎ মৎস্য) বোয়াল, শকুল এবং সামাজিক লোক পরম্পরায় যাহা নিষিদ্ধ নহে, এমত আইশ বিশিষ্ট মৎস্য বাছিয়া বাছিয়া, দ্বাদশী, অমাবস্যাদি তিথি এবং রবি, বৃহস্পতিবার প্রভৃতি পর্ব্ব দিবস ও মধ্যে মধ্যে আরও দুই একদিন বাদ দিয়া অল্পপরিমাণে আহার করিবেন। যাহা বৎসরে দুই চারি দিন ব্যতীত জুটেনা, এমন সৌখিন খাদ্য মাংস, কখনই আহার করিবেন না। এমন করিতে করিতে আমিষ আহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহারে অভ্যাস ও ইচ্ছা জন্মিবে।

হিন্দু-গৃহের বিধবা রমণিগণের শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রশান্ত অবস্থা; এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অসীম উন্নতি সাধক ফল-মূলভোজী তপশ্চারী প্রাচ্য ঋষিগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানবিৎগণের মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি ভোজনের পরামর্শ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। শুন, আমি তোমাকে একটী গল্প বলিতেছি।

পুরাকালে বিশ্বামিত্র নামক এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার মৃগয়া

ব্যাপদেশে বন ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, আতিথ্য গ্রহণা-ভিলাষে, সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের কুলগুরু তাপসশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পর্ণকুটীরে উপনীত হইলেন। মহামতি বশিষ্ঠ, যথা-বিধি সমাদর করিয়া সসৈন্য রাজকুমারকে উপবেশন করাইলেন। পরে তদীয় আশ্রমে চিরপূজিতা সুরধেনু নন্দিনীকে দোহন করিয়া, অভিপ্রেত আহার্য্যাদি প্রস্তুত করণোপযোগী প্রচুর দুগ্ধ সংগ্রহ করিলেন, এবং চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করণান্তর অত্যন্ত সমাদরের সহিত সসৈন্য রাজ অতিথিকে যথাবিহিত সংকার করিলেন। রাজ-কুমার বিশ্বামিত্র পরম প্রীতিসহকারে তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে গৃহে গমন কালে, বশিষ্ঠের নিকট সেই নন্দিনীকে প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, আমার আজন্ম আচরিত কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ এই দেব-গাভীকে আমি নিত্য পূজা করি। উহা তোমাকে অর্পণ করিবার উপযুক্ত নহে, এবং তুমিও উহাকে প্রতিপালন করিবার যোগ্য নহে। তুমি অতিথি গুরুর ন্যায় পূজনীয়; সুতরাং অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে, অকাতরে অর্পণ করিব। দুষ্টবুদ্ধি বল-দর্পিত বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি স্বেচ্ছায় না দিলে, আমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব। তুমি আমার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইলেন। দীর্ঘকাল বল পরীক্ষার পরে, বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন। তখনে নির্জ্জিত রাজকুমার ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পর্ণ কুটীরবাসী বশিষ্ঠ যে প্রকারে অতিথি সংকার করিলেন,

কোন রাজা কি তেমন পারেন! ফল-মূল-ভোজী অথবা হবিষ্যাশী, কঙ্কালসার, দীর্ঘকাল তপশ্চারী ব্রাহ্মণের সহিত, রাজভোগে পরিপুষ্টদেহ ক্ষত্রিয়-কুমার আমি, বল পরীক্ষায় পরাস্ত হইলাম। তবে রাজার ঐশ্বর্য্য, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের গৌরব কি!” আর রাজ্যের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তিনি সমাহিতচিত্তে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে তাপস বিশ্বামিত্র, বিশ্ব সংসারে দ্বিতীয় সৃষ্টি-কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। পূরাণ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, তুমি এরূপ অনেক আখ্যায়িকা দেখিতে পাইবে। তুমি হয়ত বলিবে,—“সে পুরাতন কথা” কিন্তু ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে, যথেচ্ছা-ভোজী মুসলমানের সহিত, নিরামিষ ভোজী রাজপুতগণ, শক্তিসঙ্ঘর্ষে পরাভূত হয়েন নাই।

যোগ। তবে রাজপুতগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন কেন?

দয়া। গৃহ বিরোধে, আত্মকলহে, সমবেত শক্তির অভাবে এবং কুটীল বুদ্ধির প্রতিযোগীতায় রাজপুতগণ পরাস্ত হইয়াছিলেন।

যোগ। নিরামিষভোজীর মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, রাজোপযোগী বুদ্ধিহীনতার কারণ নহে কি?

দয়া। কখনই নহে, তুমি কি মনে করিবে যে, ফল-মূল-ভোজী অথবা হবিষ্যাশী আর্য্য-ঋষিগণের গভীর গবেষণা এবং ভবিষ্যদ্দর্শনের সামার্থ্য ছিল না? তবে আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যজাতিগণ কি লইয়া কাহার আদর্শ দেখিয়া আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও আধিভৌতিকবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন?

এবং লোক-বিস্ময়কর উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন? যাহা আর্য্য-ঋষিরা চিন্তা করেন নাই, আবিষ্কার করেন নাই, এমন কোন আধ্যাত্মিকতত্ত্ব অথবা আধিভৌতিক বিজ্ঞান অদ্যাপি আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

যোগ। এখন কি আর সেকাল আছে?

দয়া। একেবারে নাই তাহাও নহে। নদী মরিয়া গেলে তাহার দাগটাও থাকে, এবং বর্ষা হইলে সর্ব্বাগ্রে সেখানেই জল বাধে। জড় বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও নীতিজ্ঞান চিন্তা করিবার মত লোক এখনও ভারতে অভাব হয় নাই তবে—। আর শারীরিক বল পরীক্ষায় নিরামিষ ভোজী বিহারি ও পঞ্জাবীগণ যে কোন কোন ক্ষেত্রে য়ুরোপীয়গণের নিকটেও হীন নহে, তাহা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ।

মৎস্য মাংস উত্তেজক (Exciting or Irritating) খাদ্য। সুতরাং মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক বিধানের (Brain and nervous system) পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট কর। এই মস্তিষ্ক এবং স্নায়বিক বিধানের উপরেই চরিত্র গঠনের যাবতীয় উপায় নির্ভর করিতেছে। যে আহার্য্যের দ্বারা এই মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক বিধানের উত্তেজনা বা উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করে, তাহা যে অপকারী খাদ্য নহে, এ কথা তুমি কেমন করিয়া বলিবে? আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটী মাত্র পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের অভিমত প্রকাশ করিব।

"Meats blunts the morals, but inflames the propensities, whereas human perfection requires the Non-

verse would you have your children became more turbulent, quarrelsome, fierce, revengeful, hating and hateful, more like beasts of prey? Then give them the more meat would you not rather render them more lamblike? Then feed them more on a vegetable diet."

(Professor C. S. Fowler.)

'আমিষ ভোজনের দ্বারা মনের সদ্বৃত্তি সমূহ মলিন হইয়া অসদ্বৃত্তি সকল উদ্দীপিত হয়; কিন্তু মানব-চরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে ইহার বিপরীত করা আবশ্যক। যদি তুমি তোমার সন্তানগণকে অধিকতর অশান্ত, কলহপ্রিয়, ক্রূর, প্রতি-হিংসাপরায়ণ, পরদ্বেষী, ঘৃণার্হ ও হিংস্রজন্তু সদৃশ করিতে চাও, তবে তাহাদিগকে অধিক মাংস ভোজন করাও। কিন্তু যদি তাহাদিগকে নিরীহ করিতে চাহ, তবে তাহাদিগকে অধিক নিরামিষ ভোজন করাও।'

বিশেষ কথা এই যে, ভারতের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যাত্ম-বাদের জগৎ-গুরু শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কেহই জীবহিংসা বা আমিষভোজন সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা সকলেই অহিংসা ও নিরামিষভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি বুঝিতে পারিনা যে, তোমরা কোন আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবহিংসা অন্যায় বোধ কর না।

যোগ। বুঝিলাম আমরা ভ্রান্ত। বলুন—শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সাধকের পক্ষে কি প্রকার আহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দয়া। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন আর বিস্তারিত বলিবার আবশ্যক নাই। সার কথা এই যে, শাস্ত্র সুপথ্য ও সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন; এবং তামসিক ও রাজসিক আহার্য্য পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মনে রাখিও ;—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

গীতা—১৬।২১

'কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী, আত্মনাশক নরকের দ্বার। এই হেতু যত্নপূর্ব্বক ঐ তিনটী পরিত্যাগ করিবে।'

ব্রহ্মচর্য্যের অত্যন্ত বিরোধী, শত্রুর ন্যায় এই কাম, ক্রোধ, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"

গীতা—৩।৩৭

সুতরাং রাজস আহার পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা ব্যতীত যদি আরও কিছুকে রজোগুণ বৃদ্ধিকর উত্তেজক বলিয়া মনে কর, সে সমস্ত খাদ্য, এবং নীচজন-প্রিয় তামাসিক আহার যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে।

"যাত যামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।"

গীতা—১৭।১০

'যাহা প্রস্তুত হইবার পরে এক প্রহর অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, নীরস, দুর্গন্ধ, দিনান্তরে যাহা পাক করা হইয়াছে, অন্যের

ভুক্তাবশিষ্ট, এবং অভক্ষ্য, এই সমস্ত আহার্য্য তামসিকগণের প্রিয়।'

"আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ।"

গীতা—১৭।৮

'আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও প্রীতি, এই সকলের বৃদ্ধিকর, রস সংযুক্ত, স্নেহযুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়।'

"সৈন্ধবং কদলীধাত্রী পনসাম্র হরিতকী
গোক্ষীরং গো ঘৃতঞ্চৈব ধান্য মুদ্গ তিলা যবাঃ॥"

'সৈন্ধব, কলা, আমলকী, কাঁঠাল, আম্র, হরিতকী, গোদুগ্ধ, গোঘৃত, ধান্য, মুগ, তিল, যব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক আহার।'

ব্রহ্মচারী যত্নপূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত হইয়া শরীরের বলাবল এবং দেশ ও কালের অবস্থানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক এই সমস্ত সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্রহ্মচারী সততই মনে রাখিবেন যে, শরীর ও মনোবৃত্তি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান পবিত্র আহার।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নিত্য-ক্রিয়ার তৃতীয় স্তর।

সায়াহ্ন-কৃত্য।

—:০:—

দয়ানন্দ কহিলেন,—জীবনের তৃতীয়ভাগে যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ সায়াহ্নকালের কর্ত্তব্য মধ্যে উহার ভাব প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম করিলেই সায়াহ্ন-কৃত্যের সময় উপস্থিত হয়। এই জীবনে কর্ম্ম-শক্তিকে পূর্ণতররূপে করিতে হইবে। এ যাবৎ তোমাকে যে কয়েকটী কর্ম্ম-সংজ্ঞা বিবৃতি করিয়াছি, মানব জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে উহার মধ্যে নিহিত থাকিলেও কাল দেশ পাত্রের অবস্থাভেদে ঐ কর্ত্তব্য সমূহ বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশবাসী একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যে প্রকারে আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারেন, অস্মদ্দেশবাসী আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে কর্ম্ম-পদ্ধতি তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। সেও দূরের কথা, পুরাকালে এইদেশে যে প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,

নানাকারণে দেশের এবং সমাজের নানাবিধ পরিবর্ত্তন হওয়ায়, ভারতবাসী আর্য্যজাতির সেই কর্ম্মপ্রণালী ও কিছু কিছু যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কি সেকালে কি একালে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই লক্ষ্য এক মনুষ্যত্ব শক্তির বিকাশ করা। তবে আমরা হয়ত সব সময়ে তাহা প্রত্যক্ষরূপে বুঝিতে সক্ষম হই না।

কৃ+তব্য করিয়া কর্ত্তব্য শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে। অর্থ—যাহা করণীয়; অর্থাৎ আপনার উন্নতির জন্য যে কর্ম্মগুলি করিতে হয় তাহাই কর্ত্তব্য। তবে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসে সূর্য্য বিষুব রেখার যতটুকু দক্ষিণ হইতে উদয় হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে; এবং সূর্য্যের গতিবিধির ন্যায় জগতের সমস্ত ব্যাপারই অল্লাধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুরাকালে প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা সহজ-সাধ্য না হইলেও কর্ম্মের একটী সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বসাময়িক অবস্থা আছে।—

"স্বাধ্যায় নিত্যযুক্তঃস্যাদান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।"

'নিত্যই বেদাধ্যয়নে রত থাকিবে, শীতাতপাদি দ্বন্দ সহনশীল হইবে, (অর্থাৎ স্বাভাবিক সুখ দুঃখাদি সহ্য করিতে শিক্ষা করিবে) পরোপকারী, সংযতমনা, সততদাতা, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত এবং সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইবে।'

এই কথাগুলির সারভাগ এই যে, মানুষ যাহাতে আমিত্বের

সীমাবদ্ধ ভাবগুলি বিস্মৃত হইয়া আপনাকে এক অনন্ত—অখণ্ড সত্তার ন্যায় দাঁড় করাইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। প্রবলতর পরোপকার প্রবৃত্তি উহার একটী সুগম পন্থা। শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

"পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে।"

যাহা পুণ্য তাহাই কর্ত্তব্য—করণীয়, তাহাই মনুষ্যত্ব শক্তির বিকাশক, তাহাই মানবের অনন্ত উন্নতি সাধক। পরোপকার এই কথাটী যেমন পুণ্যজনক অর্থাৎ উন্নতি সাধক ; তেমনি সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বসাময়িক পন্থা। তুমি হয়ত, বলিবে যে অনেকেই অল্পাধিক পরিমাণে পরোপকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং অনেকেই ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছেন ; ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং আর বিশেষ চেষ্টা করিবে কেন ? কথাটী সত্য। কিন্তু একটী বিষয় বিবেচ্য এই যে, তোমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়াছ দেবতা, মানুষ এবং দৈত্য বা রাক্ষস, এই তিন শ্রেণীর কর্ম্ম-জীবনেই পৃথিবী জুড়িয়া কাজ করিতেছে। তুমি সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেই ঐ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাইবে ; তবে দেব-প্রকৃতির লোক সংখ্যা অত্যন্ত কম। কারণ যাঁহারা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যের উপকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, পরোপকার যাঁহার সাময়িক কার্য্য নহে—স্বভাব, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাহিবার নাই, তিনি দেব-প্রকৃতির লোক। যে দেশে এই প্রকার দুই শত লোক আছেন, সেই দেশ একদিন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চসিংহাসন অধিকারের উপযোগী হইবে। অন্য যাঁহারা উপকারের প্রত্যাশা করেন, এবং আপনার স্বার্থ বহাল রাখিয়া

অবকাশ মতে অন্যের উপকার করেন, তাহারাই মনুষ্য প্রকৃতি; এবং যাহারা অন্যের অপকারের জন্যই চেষ্টিত, তাহারাই দৈত্য বা রাক্ষস প্রকৃতি। তুমি হয়ত সংসারে মনুষ্য প্রকৃতির পরোপকারী অধিক সংখ্যক দেখিবে। কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও মানবোচিত চরিত্রের পূর্ণতর প্রস্ফুটনে সমর্থ হন নাই। আর দৈত্য-চরিত্রেরত কথাই নাই। সমাজে তাহার সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল। সে যাই হ'ক, জ্ঞানের ফল স্বরূপে অত্যুন্নত চরিত্র * প্রস্ফুট করাই মানব জীবনের লক্ষ্য স্থল।

যদিও মানবের চরম লক্ষ্যস্থল প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ সাধনশীল অত্যুন্নত চরিত্র প্রস্ফুট করা। কিন্তু ভ্রান্ত মানব সাধারণতঃ তাহা বুঝে না। তা নাই বুঝুক, তবুও স্বভাব-শক্তির প্রভাবে মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্তলে লুক্কাইতভাবে ভক্তির—প্রেমেরভাব আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিতে চাহে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, মানব-হৃদয়ে ভালবাসা এবং ভালবাসার পাত্রের (জনের) মনস্তুষ্টি সাধন করিবার প্রবৃত্তি যত প্রবল, তত আর কোনটী নহে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানহীন মায়ামুগ্ধ জীব, ভক্তিরধন ভগবানকে জানেনা—বুঝেনা; তাই সে যাহাকে তাহাকে ভাল বাসিয়া, তাহার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, সাধনশীল মানবজীবনের চরম ফল ভূমানন্দের বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর আনন্দ—অকিঞ্চিৎকর সুখ অনুসন্ধান করে।

---

* প্রেম-ভক্তিপূর্ণ সাধনশীল চরিত্রকেই অত্যুন্নত চরিত্র বলা যায়।

সুখের অনুসন্ধিৎসায় মানব সারাটী জীবনকে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাইতে থাকে ; কতপ্রকারে সুখকে আয়ত্ব করিতে চাহে ; কিন্তু কিছুতেই ফললাভে সমর্থ হয় না। অনন্ত অভাব তাহাকে চিরদিন ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। এইপ্রকার সুখানুসন্ধিৎসায় ব্যাগ্র হইয়া মানব সারাটী জীবন ভরিয়া যে কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাহার মধ্য হইতে সৎকর্ম্ম-গুলির ফলস্বরূপে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে একটু একটু করিয়া জ্ঞান প্রস্ফুট হইতে থাকে। পরিশেষে জ্ঞানের চরমফলে আমিত্বের ক্ষুদ্র সীমা-বন্ধনটুকু ছিন্ন করিয়া তাহাকে এক জগদ্বিস্তৃত অনন্ত—অসীম আনন্দময় সত্তাবিশিষ্ট করিয়া তুলে ; এবং তখনই মানব প্রেমময় ভগবানের ভক্তি-মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হয় —এবং তখনই মানব প্রকৃত সুখ-শান্তি ও ভূমানন্দ অনুভব করিতে থাকে।

যে প্রকারেই হ'ক—যতদিনেই হ'ক ; এক জীবনে না হ'ক জীবনান্তরেই হ'ক, কর্ম্ম-জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয় না ; এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে, মানবের চিরবাঞ্ছনীয় ভালবাসার অখণ্ড সুখ বা ভূমানন্দ লাভের সম্ভব নাই। মানব যাহাতে এক জীবনেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়, মহা মনস্বী আর্য্যঋষিগণ জীবনব্যাপী কর্ম্ম-পদ্ধতি সমূহকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিধিবদ্ধ করতঃ তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গই মানব জীবনের প্রকৃত উন্নতির পথ। দুঃখ অর্থ কি ? অভাব। অভাবের পূরণ হইলে দুঃখ থাকে না। স্বার্থ-

চিন্তার দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত এই অভাবকে বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। সংস্কৃত প্রবৃত্তি শব্দটী তাহার দ্যোতক। প্রবৃত্তি অর্থ এই যে, সংসারের চতুর্দ্দিক হইতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আকর্ষণ করিয়া আমি বা আমাররূপ কেন্দ্রে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা। কিন্তু এই আমিরূপ কেন্দ্রটী অতি ক্ষুদ্র, এবং অত্যন্ত কণ্টক বেষ্টিত। এখানে কোনও কিছু আনয়ন করিতে হইলে, জগৎরাজ্যের সৃষ্টি-কৌশলে তাহা এত অধিক প্রতিহত হইতে থাকে যে,ভাঙ্গিয়া দুই এক টুকরা মাত্র কেন্দ্র ভূমিতে পৌছাইতে পারে। আর বড় একটা কিছু দৈবগতিকে আসিয়া পড়িলেও ঐ ক্ষুদ্র পাত্রটীতে ধরিতে পারে না। সুতরাং "দুঃখাদনন্তরং দুঃখং" অর্থাৎ স্বার্থ-সাধন-কামির আশাটী প্রতিহত হইলে, দুঃখটী জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তির ন্যায় লেলীহান জিহ্বার দ্বারা হৃদয়কে পোড়াইয়া ক্ষার করিতে থাকে। তাহার আর সুখ কোথায়? কিসে? অতএব প্রকৃতই সুখ অনুসন্ধান করিলে, স্বার্থ অর্থাৎ নিজের জন্য, এই কথাটী ত্যাগ করিয়া "আমাকে" জগৎ ভরিয়া ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ সুখের একমাত্র পন্থা। যখন তুমি আপনাকে একটু একটু করিয়া পরের জন্য উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিবে। এবং সেই শিক্ষা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়া উঠিবে। তুমি দেখিবে,জগতের প্রত্যেক পরমাণু, বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর প্রতীক স্বরূপ। পরমাণুর ন্যায় তুমি নিজে সেই জগৎরাজ্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং তখন তোমার আর নিজের বলিয়া চাহিবার পাইবার কিছুই থাকিবে না

তখন জগতের এক প্রান্তে কোন আঘাত লাগিলে, সে আঘাতে তুমিও বাজিয়া উঠিবে। যখন মানব এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, তখন সে কহিবে ;—

"আমিত জগতে বৈসি, জগৎ আমাতে।"

'আমিই সমস্ত জগৎ বিস্তৃত, অথবা সমস্ত জগৎ আমাতেই পর্য্যবসিত।' তখন তাহার আর বস্তু বিশেষ নিজের জন্য আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা থাকিবে কেন? ইহাই কর্ম্মের চরম ফল, ইহাই জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। কর্ম্মের এই চরমফল প্রাপ্তির জন্য মহর্ষিরা যে উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আশ্রম-ধর্ম্মের তৃতীয় অবস্থা বানপ্রস্থ। দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের তৃতীয়-স্তরে সায়াহ্ন-কৃত্যে তাহারই ভাবগুলি প্রস্ফুট করিতে হইবে। নিবৃত্তি উহার দ্যোতক, অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা পরার্থে প্রযুক্ত হইয়া আনন্দবোধ করে।

নিবৃত্তিরূপ পরোপকার প্রবৃত্তির প্রবলতায় স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ যেমন সুন্দররূপে শিক্ষাকরা যায়, এমন আর কিছুতে হয় না। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে নির্ম্মল ও উন্নত-ভাব গঠিত হয়; পরোপকাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রস্ফুটরূপে প্রতিফলিত হইয়া বহিরিন্দ্রিয়গণকেও সেইভাবে অভ্যস্ত করিয়া তুলে। যখন মানব হৃদয়ে দয়া নামক প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হয়; তখন সে আপনাকে ভুলিয়া, আপনার সমস্ত সত্তা অন্যের হিত-সাধনে উৎসর্গ করে। আপনার সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, মান অপমান সমস্তই তাহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিরা তাহাকে এক পবিত্রতম আনন্দময় দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলে। তখন

সেই দেব-চরিত্র-মানব, এমন কি আপন হৃদয়ের শোণিতরাশি পর্য্যন্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া পরের জন্য অর্পণ করিতে পারেন। নিজের জন্য কিছুই চাহেন না। চাহিবেন কেন? তিনি আপনার সমস্ত সত্তা পরার্থে উৎসর্গ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। যদি সংসারে কিছুতে কখনও সুখ অনুভব করা যায়, তবে সে এই আত্মবিস্মৃতি। আমরা পুত্রকে স্নেহ করিয়া, পিতাকে ভক্তি করিয়া, সহোদরকে ভালবাসিয়া এবং স্ত্রীর সহিত প্রণয়-নিবদ্ধ হইয়া তখনই সুখ অনুভব করিতে পারি, যখন আপনাকে ভুলিয়া তাহাদিগকে চিন্তা করিতে পারি; এবং আহারে বিহারে, শয়নে-স্বপনে সর্ব্বত্রেই তাহাদিগের সুখ অনুসন্ধান করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে ও সংসারের একটী গণ্ডী অর্থাৎ সীমা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাই আমাদের সেই সুখ প্রতিহত হয়, এবং ক্ষণিক বলিয়া বোধ হয়।

যখন জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি অন্তঃক্রিয়া ও প্রতি-মূর্ত্ত্যাদির পূজা ও পরোপকার প্রভৃতি বাহিরের কার্য্যসমূহের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা অভ্যন্তরের মায়া মোহ প্রভৃতি অবিদ্যাজনিত আবরণগুলি অপসারিত হইয়া কূটস্থ চৈতন্যরূপী জ্ঞান-দেবতার বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে; তখন স্ত্রী-পুত্র ভগ্নী-ভ্রাতা প্রভৃতি সংসারের ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্ব সংসারের জীবমাত্রেই তাহার মিত্র বা আত্মীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়; এবং তিনি তাহাদিগের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অনন্ত—অসীম অখণ্ড আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

মানবের কর্ম্ম-জীবনের এই চরমোন্নতির জন্য দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের তৃতীয়ভাগে যে শাস্ত্রসমূহে (বেদান্তাদি অথবা ভক্তিগ্রন্থ ভাগবতাদি) আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে অনন্ত—অসীম অখণ্ডরূপে চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের চরণ তলে আপনাকে অবাধে ঢালিয়া দিয়া আত্মসত্তা বিস্মৃত হইতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই সৎ-শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে; এবং শীতাতপ, বর্ষণবারি উপেক্ষা করিয়া প্রথমে প্রতিবেশী, পরে নগরবাসী, পরে দেশবাসী, পরে বিশ্ববাসী জীবসমূহকে মিত্র বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের হিতাহিত চিন্তায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে প্রয়াস পাইবে। তাহাদিগের নিকট প্রতিদান স্বরূপ কিছুই চাহিবে না। ইহাই কর্ম্ম-জীবনের তৃতীয় অবস্থা বানপ্রস্থ এবং সায়াহ্ন-কৃত্য।

পরোপকার করিবে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কিছুই চাহিবে না। মনে করিবে না যে, কাহারও জন্য কিছু করিয়া তাহার অভাব উন্মোচন করা হইয়াছে; অতএব সে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুক। বরং মনে করিবে যে, সে অভাব সম্পন্ন হইয়া তোমার চরিত্র প্রস্ফুটনের সহায়তা করিয়াছে; সুতরাং সে অত্যন্ত আত্মীয়। এ সংসারে অসংখ্য অভাবগ্রস্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য অসংখ্য দাতাও মুক্ত হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার সাহায্য না পাইলেই যে কেহ মরিয়া যাইবে, এমন নহে। যদি প্রকৃতি তাহার আবশ্যক বোধ করেন, অর্থাৎ তাহার বাঁচিয়া থাকাই বিধান থাকে, তবে কেহ না কেহ তাহাকে

সাহায্য করিবে। কিন্তু ভগবান তোমার সাধনার ফলস্বরূপে তোমাকে উন্নত করিবার জন্য যে সুযোগটী অর্পণ করিয়াছিলেন, তুমি অহঙ্কারে অবশ হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে অনন্ত অবনতির দিকে চালাইতে প্রস্তুত হইও না।

ইহাই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়, এবং গীতোক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র" ইত্যাদি নবম শ্লোকের শিক্ষা। শ্রীধরস্বামীর টীকায় বর্ণিত "বিষ্ণু প্রীত্যর্থ মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মং সম্যগাচর" প্রভৃতির মর্ম্ম। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহাই মানবের মুখ্যধর্ম্ম।

এই নিষ্কাম কর্ম্মের—এই মুখ্য ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, চির-সুখ-শান্তির আবাস ভূমি সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকার জন্মে; এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য প্রেম-ভক্তির উৎস আসিয়া মানবকে চিদানন্দ ভাব-সমুদ্রের চিরানন্দ লহরী মালায় নাচিবার উপযোগী করিয়া তুলে।
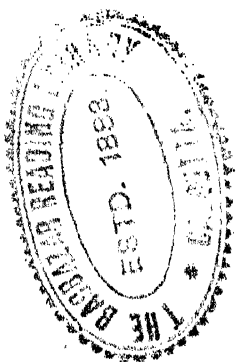
ঊনবিংশ অধ্যায়।

—:০:—

নিত্য-ক্রিয়ারচতুর্থ স্তর।

সান্ধ্য-কৃত্য।

দয়ানন্দ। মানবজীবনের চরম উন্নতি জ্ঞান-কর্ম্মের সমন্বয়ে প্রগাঢ়তর ভক্তিভাব প্রস্ফুট করা। চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবনেই তাহার বিকাশ হওয়া সম্ভব। ফলকথা এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমের আচরিত কর্ম্মের ফলপ্রসূ ক্ষেত্র সন্ন্যাসাশ্রম বা সন্ন্যাস অবস্থা। এখানেই সমস্ত জীবনব্যাপী সৎকর্ম্ম সমূহের ফলরাশী প্রস্ফুট হইতে থাকে। দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের চতুর্থ ভাগ সান্ধ্য-কৃত্যে তাহার ভাবগুলি প্রস্ফুট করিতে চেষ্টা করিবে।

যোগ। সন্ধ্যাকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি কি ?

দয়া। সন্ধ্যাকালে প্রথম কর্ত্তব্য উপাসনা। পরে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্ত্যাদির পূজা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ শ্রীমূর্ত্তি বিগ্রহের সান্ধ্য-আরত্রিকাদি * গুরূপদিষ্ট

---

* আরতি।

প্রণালী মতে সম্পাদন করিয়া বিগ্রহ সমক্ষে,—আর যাঁহার সে সুযোগ পান নাই, তাঁহারা ধ্যানময় মূর্ত্তি সমক্ষে আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা বাক্য পাঠ করিবেন। পরে প্রার্থনাসূচক অথবা আপন আপন উন্নতির অবস্থা বুঝিয়া ভক্তিভাবদ্যোতক কীর্ত্তনাদি করিবেন কিম্বা কেবলমাত্র "নাম কীর্ত্তন" করিবেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে ভরিয়া উঠিবে। তিনি আপনাকে ভুলিয়া বিশ্বকে ভুলিয়া বিশ্বেশ্বরের রূপ দর্শনে, গুণ কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া যাইবেন। কিছুদিন এই প্রকারে প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলি সূচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিলে, তাঁহার পরম পবিত্র হৃদয় মধ্যে এক অভিনব স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সে রাজ্যের রাজা রাজরাজেশ্বর শ্রীভগবান, তাঁহার হৃদয়মধ্যস্থ শুভ্র-সরসিজ-সিংহাসনে নিত্য-নিয়ত বিরাজিত রহিয়া নিত্য নব-বিকশিত—নব প্রফুল্লিত চির মাধুর্য্যময় রূপরাশিতে হৃদয় আলোকিত করিয়া তুলিবেন। সহস্র সহস্র সুধাকরের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-বিনিন্দিত তদীয় চরণ নখাগ্র হইতে মন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহের ন্যায় বিগলিত প্রেম-ধারায় সাধককে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে। তখন তাঁহার প্রাণে ভক্তির বন্যা, প্রেমের প্রবাহ উছলিয়া উঠিবে; আর সদাশিবের ন্যায় সদানন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আপনা ভুলিয়া বিশ্ব ভুলিয়া বিশ্বেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে আত্মহারা হইবেন। তখন চর স্থাবর জঙ্গম জলাত্মক. বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্বনাথের পবিত্র প্রতিমারন্যায় মনোমুগ্ধকর রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান,—

"যাহা যাহা আখিস্ফুরে তাহা কৃষ্ণ দেখে।"

এবং করপুটে বলিতে থাকেন,—

"দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বা।"

গীতা—১১।২০

'পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল একমাত্র তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ।'

তখন সাধকের প্রাণ—ভক্তের প্রাণ ভাবে ভরিয়া যায়, প্রেমে গলিয়া যায়, দাস্যতায় বৃত্তিসমূহ ও ইন্দ্রিয়গণ সতঃস্ফুরিত হইয়া তৃণাদপি নীচতার দ্বারা আপনাকে ভগবানের চরণতলে ঢালিয়া দিয়া কোটী কোটী প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্তি বোধ করিতে পারেন না। তাই ভক্ত ভাব-বিহ্বল-চিত্তে বলিতে থাকেন,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চঃ
নমঃ নমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্বঃ
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্তং সর্ব্বং সমাপ্নোঽসি ততোঽসি সর্ব্বং॥

গীতা—১১।৩৮—৪০

ভক্ত ভক্তিরধন ভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই প্রীতি অনুভব করিতে পারেন না। তাই তিনি বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ বিশ্বসেবায় আত্মনিয়োগ করত আনন্দে আত্মহারা হইয়া দুটী বাহু তুলিয়া প্রেমে গলিয়া হরি বলিয়া নাচিয়া বেড়ান। তখন তাঁহার রসনা,রসিকশেখর রাসবিহারীর লীলাকীর্ত্তনে শতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। তখন আনন্দময়ী

হ্লাদিনী শক্তি যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আননে, নয়নে, এমন কি প্রতি লোমকূপেও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

বল যোগজীবন, সেই অবিরাম আনন্দ উৎস উত্তরণ করিয়া দুঃখের ক্ষীণ-কৃষ্ণমূর্ত্তি সে হৃদয়ে আবির্ভাব হইতে পারিবে কেন! সেথা যে আনন্দরাজ্যের অধীশ্বর রাজরাজেশ্বর চিদানন্দ ভাব-বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত। আর সেই শক্তির অধীশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান শ্রীভগবান যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, তাঁহার আর কোন শক্তির অভাব আছে? তাঁহার শক্তি প্রভাবে প্রভাকর পরাভূত হয়, সমুদ্র বিশুষ্ক হয়, গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হয়, জড় চৈতন্যলাভে সমর্থ হয়। আর তাঁহার ইচ্ছায় ভক্তবৎসল ভগবান জীবন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশের—দশের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কর প্রসারণ করিয়া কাতরগণের অশ্রুধারা মুছাইয়া দেন। যখন ভারতে এই প্রকার সাধকগণ বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহাদের পবিত্রশক্তির আকর্ষণ প্রভাবে দুষ্কৃত-দলিত সাধুজনের পরিত্রাণ জন্য জগন্নাথ অবতাররূপে অবতরিত হইতেন।

বল যোগজীবন পারিবে কি, সেই সাধকের সাধন-সিদ্ধ পুণ্য-প্রভাবময় পবিত্রতম **শক্তি-সঞ্চয়** করিতে?

যোগজীবনের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে অভিভূত হইয়া গেল। সহসা তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ানন্দের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং উত্তপ্ত অশ্রুরাশিতে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, আমি ভ্রান্ত, আমি জীবনের সমর্থবান সময় অযথা নষ্ট করিয়াছি। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, চক্ষু ফুটিয়াছে; কিন্তু শক্তি কোথায়! দাও প্রভু বল দাও, যেন দাড়াইতে পারি।

দয়ানন্দ যোগজীবনের হাত ধরিয়া কহিলেন উঠ যোগজীবন উঠ। তুমি ভাগ্যবান, তুমি ধন্য। অনুতপ্ত জীবনেই আত্মোন্নতির দ্রুতক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমি বলের ভিক্ষুক, তোমায় আর কি বল দিব। আইস আমরা উভয়ে সেই পতিত-বান্ধব প্রণত-বন্ধু শক্তিশ্বর জগদীশ্বরের চরণতলে আশ্রয় লইয়া শক্তি ভিক্ষা করি। যেন সেই কৃপাপারাবারের করুণাকনা-সিঞ্চনে আমাদের মরুভূমি সদৃশ উষর হৃদয়ে ভক্তিরূপিনী মহাশক্তির সঞ্চার হয়। শুধু আমরা কেন, তাঁহার চির-মাধুর্য্যময়ী লীলা-নিকেতন ভারতের আর্য্যসন্তানগণ, আর্য্য-কীর্ত্তি-কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত মুকুট পরাইয়া সুচিরসন্তপ্তা ভারত-মাতাকে আবার যেন ধর্ম্মের সিংহাসনে সমাসীন করিয়া ভক্তি-ভরে—আনন্দভরে নাচিতে পারে।
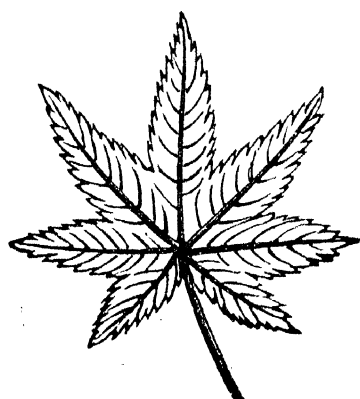
বিংশ অধ্যায়।

আদর্শ জীবনে।

তপস্যা।

—:০:—
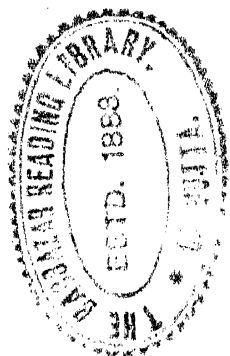
শক্তি-সঞ্চয় বিবৃতি করা শেষ হইয়াছে। যোগ জীবনের প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। যোগজীবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, দয়ানন্দের উপদেশ মতে আপনার জীবনকে গঠন করিবেন ও স্বদেশ-সেবায় নিয়োগ করিবেন এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু পারিবেন কি? তিনি এই সমস্ত চিন্তার গভীরতায় আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত গঙ্গাতীরস্থ বাঁধাঘাটের এক প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে দয়ানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যোগজীবন! কি চিন্তা করিতেছে।

যোগজীবনের চিন্তাপ্রবাহ ভঙ্গ হইল। তিনি কাতরকণ্ঠে কহিলেন প্রভু! হৃদয়ের অনেক অন্ধকার দূর করিয়াছেন আর একটু বাকি আছে।

দয়া। বল সেটুকু কি?

যোগ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হীনশক্তি মানবের ইচ্ছায় ভগবানের অবতারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

দয়া। কেন? ভগবান নিজেই বলিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

(হে ভারত) 'অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভারতে
আপনি সৃজিব আমি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতে॥'

ধর্ম্মপন্থায় স্বেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে, আপনার জগৎকে রক্ষা করিতে জগদীশ্বর আপনি আসিয়া অবতীর্ণ হন। তবে মানবের চেষ্টা তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র। শুন, তোমাকে তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা বলিতেছি।

খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমান সম্রাট বল্লাল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রবলপ্রতাপের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন, তখন দেশ ভয়ানক বিপ্লবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বিদেশাগত নবশক্তিশালী রাজার জাতির অত্যাচার ও প্রলোভনে ধর্ম্মের পথে তাহাদিগের অনুসরণ করা পরাজিত

জাতির পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যাহারা তাহা করিত, আর্য্যসমাজ তাহাদিগকে বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ফলে কেহবা হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার দোহাই দিয়া মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, কেহবা অনিচ্ছাসত্বে মুসলমান হইয়া গেল। অন্যদিকে সেই সময়েই পর্টুগিজজাতি এইদেশে পাশ্চাত্য দেশের—পাশ্চাত্য জাতির প্রতিভার ক্ষীণ প্রভা বিস্তার করিতেছিল; সে আলোকের দিকেও অনেকের চক্ষু পড়িল। অন্যদিকে রাজনীতিক বিপ্লবের সূত্রপাত হইতেছিল; তাহারা বুঝিবা আর একটা নূতন জাতি গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। এই প্রকারে বিরাট আর্য্য সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া, সহস্র সহস্র লোক অন্য সমাজের কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিল। তদানীন্তন আর্য্যসমাজে প্রচলিত স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রের ব্যবস্থায় উহাদিগের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আর্য্যসমাজ আপনাকে নির্ম্মল ভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার ফলে জাতীয়-জীবনে দুর্ব্বলতা লাভ হইতে লাগিল মাত্র। অন্যদিকে সামাজিক কর্ম্ম-জীবনের সমস্ত দেহে যাঁহারা হৃৎপিণ্ডের ন্যায় শোণিত সঞ্চালন করেন, সেই তত্বানুসন্ধিৎসু দার্শনিকগণের মধ্যেও ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। অর্থাৎ শঙ্কর-কথিত অদ্বৈতবাদ নিরসন করিয়া, ন্যায়দর্শন এমন প্রবল প্রতাপের সহিত আপন প্রতিভা প্রচার করিতেছিল যে, শঙ্করাচার্য্যের অপূর্ণ মতের পূর্ণতা প্রতিপাদক রামানুজ-কথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের (যাহা প্রকৃতই সমস্ত দর্শনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছে।)

ভক্তি-সলিল-সিঞ্চিত ক্ষীণপ্রাণ বৈষ্ণব-দর্শন সমাজক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয় আর্য্য-রাজগণের ব্যক্তিগতশক্তি ক্ষীণ হইতে হইতে এই সময় এমন দুর্বলতা লাভ করিয়াছিল যে, এই প্রকার বিপ্লবগ্রস্ত দেশে দেশপতি-গণের নিকটে কোন সাহায্য লাভের আশাই ছিল না। সুতরাং প্রকৃত দেশহিতাকাঙ্ক্ষিগণের পরপ্রাণ উদারহৃদয়, সামাজিক-ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গগনের অন্ধ তমসার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভীত—কম্পিত হইল ; তাঁহারা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন মাত্র।

এই সময়ে রামানুজ-কথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পঞ্চদশ প্রচারক দেশ-প্রাণ মাধবেন্দ্রপুরী দেশের কথা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং প্রাণের ব্যাথা, হৃদয়ের ভার লইয়া দেশে দেশে—দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কত দেশ—কত নগর ভ্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় রাজধানী সমগ্র বঙ্গদেশের সুধী সজ্জনগণের সম্মিলন-ক্ষেত্র—আর্য্যজাতির চির-গৌরবের একমাত্র সম্পত্তি সংস্কৃত ভাষা আলোচনার বিদ্যা-মন্দির নবদ্বীপে আসিলেন। সেথায় দেখিলেন ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনার প্রবল প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। মাধবেন্দ্রপুরীর কাতর-কণ্ঠের পিপাসা সেই উত্তপ্ত সলিলে মিটিল না, তিনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিনয়, নম্রতা, কোমলতার জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ কমলাক্ষ নামক এক যুবক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন,

এবং তাঁহারই দরিদ্র আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়া কয়েক দিবস বিশ্রাম করিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের নিকট নীরব ভাষায় অব্যক্ত ভাবে প্রাণ বিনিময় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন কয়েক দিবস একত্রে অবস্থিতি করিয়া বহু আলোচনার পরে কমলাক্ষ গলিয়া গেলেন। তিনি মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

কমলাক্ষ বাল্যকালে পিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে এইদেশে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। এইদেশে তাঁহাদিগের কোন সম্পত্তি ছিলনা; সুতরাং তাঁহারা চিরদরিদ্র। তিনি ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বিবাহিত জীবনে অর্থের অভাব তাঁহাকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। অপরদিকে যেমন হইয়া থাকে, তেমনি তাহার দারিদ্র্য নিষ্পেষিত ক্ষীণ-হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তি-মন্দাকিনীর পূতপ্রবাহ প্রবল বেগে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিলেন, এবং শিশিক্ষুগণকে শাস্ত্রের সহিত ভক্তি-ধর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই নবীন অধ্যাপকের ভক্তিবাদ আলোচনার যশঃসৌরভে ভক্তবিরল নবদ্বীপের গৃহকোণে লুক্কাইত ক্ষীণ-প্রাণ ভক্তগণের হতাশহৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে শান্তির শীতলচ্ছায়া উপভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তগণের সম্মিলিত শক্তি শাস্ত্র-চর্চ্চার স্নিগ্ধ-সেকে

সরস ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল ; এবং ভক্তির পবিত্র প্রবাহ লজ্জা ভয়ের কবাট খুলিয়া হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। ভক্তগণ "হরেকৃষ্ণ হরি" বলিয়া বাহু তুলিয়া আনন্দভরে নাচিয়া নাচিয়া উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নবদ্বীপের বিস্ফারিত বক্ষে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎ সিংহাসনের সম্মুখে স্বর্গীয় সুধার প্রবাহ বহিতে লাগিল। কিন্তু সেই প্রেম-প্রস্রবণ বিগলিত নাম-সুধার পরম পবিত্র স্নিগ্ধধারা নবদ্বীপের নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, বৈষয়িক যাজকগণের কর্ণকুহরে তপ্ততৈলের ন্যায় জ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। তাঁহারা এই ভক্তি-চর্চ্চার—নাম কীর্ত্তনের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "বেদান্ত পড়িবে, তত্ত্ব আলোচনা করিবে, মুক্তির হেতু জ্ঞান-চর্চ্চা করিবে, সে সব কিছুই নাই ; কেবল "হরিবোল" "হরিবোল" ; উহাতে কি হইবে ?" কেহ বলিলেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" যে আত্মা জ্ঞানের চরম লভ্য, তাহাকি বাক্যের দ্বারায় লাভ হয় ?" কেহ বলিলেন "বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই, সন্ধ্যা নাই, পূজানাই, ইহাতে কোন ধর্ম্ম সাধন হয় ?" আর কেহ "বলিলেন, ইহারা দিবারাত্রি চীৎকার করিয়া দেশ হইতে লক্ষ্মী তাড়াইল, ফলে ধান চাউল মহার্ঘ্য হইবে। বিশেষতঃ সাধারণের শান্তি নষ্ট হইতেছে ; সুতরাং কাজীর নিকট নালিশ কর, অথবা ঘর ভাঙ্গিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।" ইত্যাদি প্রকারে ভক্তগণের প্রতি অত্যাচারের কল্পনা হইতে লাগিল ; কোথায় ও বা অত্যাচার হইল।

আমাদিগের ভক্ত প্রাণ অধ্যাপকের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত

লাগিল। তিনি ভক্তি ও ভক্তের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে শান্তিপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন, কি হইয়াছে?"

কোমলহৃদয়া পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর সহানুভূতির শীতল-স্পর্শে ঠাকুরের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। ঠাকুর আবেগ-ভরে আখিরজলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সীতা! সীতা! ভক্তির গন্ধমাত্রও দেশ হইতে দূরে পলাইয়াছে। ভগবানের নামের ও ভগবদ্ভক্তগণের অবমাননা হইতেছে। ভক্তি ও ভক্তের ভগবান কেমন করিয়া দেখিতেছেন? আমি তাঁহাকে ডাকিব; আনিব; এবং দেশের দুর্দ্দশা দেখাইব।"

সীতাদেবী কহিলেন, "তাও কি হয়! মানুষে কি তাহা পারে?"

ঠাকুর কহিলেন, "শাস্ত্র কি মিথ্যা! শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

"তুলসীদল মাত্রেন জলস্য চলুকেনবা
বিক্রিণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসল॥"

'একটী তুলসী-পত্র এবং এক গণ্ডুষ জলের বিনিময়ে ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে পারেন।"

"দেখ সীতা! আমি এই তপস্যায় বসিলাম, যদি সিদ্ধি-লাভ হয়—যদি ভগবানের আবির্ভাব হয়, তবেই আমার জীবন

সার্থক। নতুবা এ জীবনে আর কাজ কি! দেখিও তুমি আমায় বিরক্ত করিও না।”

সীতাদেবী মনে মনে বলিলেন “স্বামী, তুমি দেবতা। তোমাতে সকলই সম্ভব!”

কতদিন গত হইলে কে জানে, ফাল্গুণী পূর্ণিমার পবিত্র নিশীথে তাপস-শিরোমনী ঠাকুর আমার হাত তুলিয়া ডাকিলেন,—“এস এস প্রভু এস! দেখ দেখ! তোমার দেশ দুর্দ্দশার চরমে উপনীত হইয়াছে, ধ্বংসের বিভীষণ অভিনয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। আর কে রাখিবে? কাহার সাধ্য আছে? তুমি এস! তুমি দেখ! তোমার দেশ তুমি রাখ।”

ঠাকুর চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কান পাতিয়া শুনিলেন,—নব-বৃন্দাবন নবদ্বীপের বৃক্ষ-বল্লরী প্রেমে গলিয়া আপনা ভুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া আনন্দভরে “হরেকৃষ্ণ হরে” গাহিতেছে। সিন্দুর-শোভিনী সীমন্তিণিগণ জয়ধ্বনির সহিত “হরিধ্বনি” মিলাইয়া আকাশপানে চাহিয়া আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছে। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র একপ্রাণে একতানে “হরেকৃষ্ণ হরে” নাম-গানে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া হাত তুলিয়া কাহাকে আহ্বান করিতেছে। বসন্ত-অনিল-অন্দোলিতা পাপ হারিণী সুরধুনী কল কল ধ্বনীতে উছলিয়া উঠিয়া কুল ছাপিয়া পাপ-তাপ ধুলি-ধুসরিত নবদ্বীপের বিস্ফারিত বক্ষ বিধৌত করিতে ছুটি-তেছে। সেই শুভ মূহূর্ত্তে—সেই বাসন্তি-কৌমুদী-বিধৌতা হাস্যোৎফুল্লা আনন্দময়ী নিশীথিনীর স্মৃতি-কাহিনী কালের বক্ষে অমরাক্ষরে রঞ্জিত করিয়া গোলকবিহারী গোপীবল্লভ, নবীন-

নীরদ-নিন্দিত নীলতনুখানি কোথায় রাখিয়া, আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তি পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধার বিদ্যুদ্বর্ণ অঙ্গকান্তি গায় মাখিয়া প্রেম-পুলকীত গোরা (আমার) "গৌরহরি সাজিয়া" বাসন্তী-ব্রততীর স্বভাব-বিভব প্রস্ফুট মল্লিকায় গাঁথা মালার গায়ে ত্রিদিব-বিভব পারিজাত পরাগের কণা মাখিয়া, দুইহাতে ধরিয়া জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের অপামর সাধারণকে সেই প্রেমের মালায় বেষ্টিত করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া শচীদেবীর সোনার অঙ্ক সমুজ্জ্বল করিতে "গৌরহরি" গোলক ছাড়িয়া ভূলোকে আগমন করিতেছেন। সাধকের প্রাণ প্রেমে গলিয়া গেল, আনন্দে উছলিয়া উঠিল। ঠাকুর ডাকিলেন,—সীতা! সীতা! ঐ দেখ, ভক্তের ভগবান, ভক্তের—ভক্তির অবমাননা কেমন করিয়া সহিবেন! ভক্ত ছাড়িয়া কতদিন দূরে রহিবেন! আর ভয় নাই, আসিয়াছেন।

সত্য সত্যই পরদিন প্রভাতে তরুণ তপনের কিরণ কণায় নূতন আলোক দেখা দিল। সত্য সত্যই পরদিন প্রভাতে নদীয়া নিবাসী নরনারিগণ দলে দলে আসিয়া দেখিল, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি দ্বাত্রিংশৎ চিহ্নশোভিত সোনার বরণ সোনার কিরণ এক সোনার ঠাকুর শচীমাতার সোনার কোল শোভা করিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-প্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকিত হইয়াছে।

প্রভূ আসিলেন,—ভারতের সেই জাতিগত, কর্ম্মগত, জ্ঞানগত বিপ্লবের মধ্যে সেই ভারত-ভাগ্য-গগণের অন্ধতমসা রাশী বিনাশ করিয়া ফাল্গুণী পূর্ণিমার হাস্যময়ী রজনীতে

পূর্ণসুধাকরের ন্যায় সুধাধারা ঢালিয়া বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপন করিয়া আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনে পীযূষ-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিতে—তৃষিত ভারতবাসীকে "হরেকৃষ্ণ" নামামৃত পান করাইতে প্রভু আসিলেন। অলস—অবশ সংজ্ঞাহীন আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনে চেতনার ধারা ঢালিয়া চৈতন্য আমার নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ভক্তি-ধর্ম্ম ও তাহার সাধন-প্রণালী প্রচার করিয়া বৈদিক যুগের ঋষি-কথিত গূঢ় রহস্যবিশিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি সুমেরুশৈলের ন্যায় দৃঢ়ীভূত করিয়া আর্য্যজাতীর জাতীয়-জীবনে অমরতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন।

আর আমাদের সেই অধ্যাপক,—যাঁহার কঠোরতর সাধন-শক্তির প্রবল আকর্ষণে জগদাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ গোলক ছাড়িয়া ভূলোকে আসিলেন ; আমাদের সেই অধ্যাপক, আশ্রম ধর্ম্মের বিধান অনুসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘরে থাকিয়া অদ্বিতীয় অধ্যাপকের ন্যায় বর্ণাশ্রম-বিধানের সহিত ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠা অমরাক্ষরে রঞ্জিত করিয়া, অদ্বৈত আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া আদর্শজীবনের—আদর্শ চরিত্রের অমর-কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে ভারতের সম্মুখে চিরদণ্ডায়মান রহিলেন।

পরিশিষ্ট।

শিক্ষা-পঞ্চাশৎ।

গঙ্গাতীরোপবিষ্ট যোগজীবনকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যোগজীবন! কি চিন্তা করিতেছ?

যোগজীবন বলিলেন,—একটা কথা ভাবিতেছি এই যে, আপনার কথিতমতে নিত্য-ক্রিয়ার দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা, আজকালকার দিনে স্কুল কলেজের ছাত্রগণের এবং চাকরিজীবী বাবুদিগের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

দয়া। অসম্ভব কি?

যোগ; তাঁহাদিগের সময় অত্যন্ত অল্প।

দয়া। পৃথিবীতে সাধারণ লোকের মধ্যে যিনি অকারণ চিন্তা, আমোদ-প্রমোদ, অথবা আলস্যের জন্য প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন না, তিনি কর্ম্ম-দেবতা। কিন্তু আমি জানিনা যে এই পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমাদিগের দেশে—আমাদিগের সমাজে এমন কতগুলি লোক আছেন। সুতরাং আমি বলি যে, প্রতিদিন যে সময়টুকু অকারণ নষ্ট হয়, সেই সময়টুকু ব্যাধিপীড়িত আমাদিগের চিকিৎসার্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমোদ আহ্লাদ,

বাজে কথা ছাড়িয়া দিলে. মানবজীবন এমন নিরস—এমন কর্কশ হয় যে, তাহা বহন করাও কষ্টকর। কথাটী সত্য, কিন্তু পীড়িতের চিকিৎসার জন্য কিছুদিন এই প্রকারে নীরস—কর্কশ জীবনভার বহন করিতে হইবে। পরে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—অনুভব করিতে পারিবেন যে, নিত্য-ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁহাদিগের নিরস জীবনে সুধা-ধারা সিঞ্চিত হইতেছে।

আজকালকার অবস্থানুসারে অফিসগামী বাবুদিগের অপেক্ষা স্কুল কলেজের ছেলেদিগের সময়ের অভাব হয়। কারণ তাহাদিগের বাটীতে আসিয়াও অধ্যয়ন অনুশীলন করিতে হয়। আমি সেই ছেলেদিগের কর্ম্ম-জীবন গঠনপ্রণালী তোমার নিকট বলিতেছি, তাহা হইলে তুমি সকলের বিষয় বুঝিতে সমর্থ হইবে।

ছাত্রগণ প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকার সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য-ক্রিয়ার প্রথম স্তরে বর্ণিত মতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবেন। ছাত্রগণ মধ্যাহ্নকালে স্কুল কলেজের অধ্যয়ন ব্যাপারে আবদ্ধ থাকিবেন ; সুতরাং মধ্যাহ্ন-কৃত্যের কোন কোন কার্য্য প্রাতঃকৃত্যের সহিত এক সময়ে সম্পাদন করিতে হইবে। এজন্য মধ্যাহ্ন-কৃত্য পিতৃতর্পণ, প্রাতঃস্নান অন্তে আচমন করতঃ সূর্য্যোপস্থাপন করিয়া অথবা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিরা জল দ্বারা সম্পাদন করিবেন।

পরে গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট প্রাতঃকৃত্য এবং মধ্যাহ্নোচিত ব্রহ্ম-যজ্ঞাত্মক জপাদি সম্পাদন করিয়া, কিছুক্ষণ যাবৎ ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন অথবা সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। পরে ছাত্রোচিত

অধ্যয়নে মনোভিনিবেশ করিবেন। তৎপরে মধ্যাহ্নোচিত আহার ও বিশ্রাম করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবেন। ছাত্রগণ নিজেরাই পিতা, ভ্রাতা, অথবা অন্যের সাহায্যাপেক্ষী ; সুতরাং "নৃযজ্ঞ"—অতিথি-সেবা, কুটুম্বপোষণ, কিংবা ভূতযজ্ঞ—পশু পক্ষ্যাদিকে আহার প্রদানের জন্য তাঁহাদিগের চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু নিজের আহার্য্যাদি সম্বন্ধে মধ্যাহ্ন-কৃত্যে বর্ণিত মতে বিচার করা আবশ্যক আছে।

সায়াহ্নকালে (বিকালে) বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ব্যায়াম অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রমের জন্য দরিদ্রগণের হিতসাধনোপযোগী কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন ; এবং সময় ও সুযোগ পাইলে সৎসংসর্গে মিলিত হইয়া সাধু আলোচনা করিবেন।

ফুটবল (Foot Ball) আমাদিগের দেশের খেলা নহে। যে দেশের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইতে শিখিয়াছে, এবং পেট ভরিয়া সারবান খাদ্য খাইতে পায়, ফুটবল সেই দেশের উপযুক্ত খেলা। আমাদিগের দেশের বালকগণের, সাধারণের অথবা দরিদ্রগণের হিতকর কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া শারীরিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টিত হওয়াই কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে অত্যন্ত সঙ্গত। ইহা করিয়া যদি কাহারও সময় ও সুযোগ হয়, তবে সাঁতার কাটা, মুগুরভাজা, বুকডন, অভ্যাস করা মন্দ নহে।

উক্ত প্রকারে সায়াহ্ন-কৃত্য সম্পাদন করিয়া, সন্ধ্যাকালে কিয়ৎক্ষণ যাবৎ সান্ধ্য-কর্ত্তব্য—সন্ধ্যোপাসনা ও কীর্ত্তনাদি (দলবদ্ধ

হইয়া নহে—একাকী) করিয়া আহার করিবেন। পরে অধ্যয়ন করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

গৃহস্থগণ, তাঁহাদিগের আপন আপন সুযোগ ও সুবিধামত নিত্য-ক্রিয়ার সময় স্থির করিয়া লইবেন। বোধ হয় এই প্রকারে কার্য্য করিতে কাহার ও অসুবিধা হইবে না। তবুও তোমার প্রতিতীর জন্য আমি একটী দিনলিপি বলিতেছি শুন।

কর্ত্তব্য।	সময়।
গাত্রোত্থান।	প্রত্যূষ ৫ ঘটীকায়
তৎকালীন পাঠ ও চিন্তা।	৫ মিঃ = ৫ — ৫
বহির্গমন, মুখ প্রক্ষালনাদি।	২০ মিঃ = ৫ — ২৫
ব্যায়াম ও বিশ্রাম।	২০ মিঃ = ৫ — ৪৫
স্নান ও তর্পণাদি।	২০ মিঃ = ৬ — ৫
উপাসনা ও পাঠ।	৪০ মিঃ = ৬ — ৪৫
অধ্যয়ন।	২ — ২০ মিঃ = ৯ — ৫
আহার।	১৩ মিঃ = ৯ — ১৮
বিশ্রাম।	১২ মি = ৯ — ৩০
স্কুল, কলেজ, অথবা অফিসাদিতে গমন।	
প্রত্যাবর্ত্তন।	,, = ৫ — ৩০
বিশ্রাম ও জলযোগ।	৩০ মিঃ = ৬ — ০
সায়াহ্ণ-কৃত্য ও ব্যায়ামাদি।	১ — ০ = ৭ — ০
সান্ধ্যকৃত্য।	৪০ মিঃ = ৭ — ৪০
আহার।	১৫ মিঃ = ৭ — ৫৫

বিশ্রাম।	...	...	১৫ মিঃ = ৮ — ১০
অধ্যয়ন।	...	... ৩ — ৩৫ মিঃ = ১১ — ৪৫	
ভগবচ্চিন্তা।	...	...	১০ মিঃ = ১১ — ৫৫
নিদ্রা।	...	...	৫ — ৫ = ০ * ৫

ছাত্রগণের অধ্যয়নের জন্য যে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে চাকরিজীবিগণ সেই সময়ে গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে পারেন। যাঁহার তাহা না করিতে হয়, তিনি পরোপকার, সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা স্বাধীন জীবিকা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন। বলিতে বলিতে দয়ানন্দ চাহিয়া দেখিলেন আজ যোগজীবনের মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি কি এক স্বর্গীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া দয়ানন্দ বলিলেন যোগজীবন! বোধ হয় তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।

যোগজীবন বলিলেন, বিশেষ কিছু মনে হয় না।

দয়ানন্দ তবুও পূর্ব্বালোচিত বিষয়গুলি পুনরায় সংক্ষিপ্ত-রূপে আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন; শুন, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণযোগ্য আরও কয়েকটী কথা বলিতেছি;—

১। সর্ব্বদা যাঁহারা সদালোচনা করেন, তাঁহাদিগের সংসর্গ করিবে।

২। মন্দ চিন্তা করিবেনা, এবং যাহারা মন্দ চিন্তা বা মন্দ আলাপ করে, কখনও তাহাদিগের সহিত মিশিবেনা।

৩। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে কখনও মনে কুচিন্তার আবির্ভাব

* সুস্থ শরীরে পাঁচঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট হয়।

হয়, তখনে মাতৃচিন্তা করিবে এবং উচ্চৈস্বরে "হরে কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে।

৪। অবকাশকালে কখনও চুপ করিয়া একাকী বসিয়া থাকিবে না, সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্যাপৃত রহিবে, অন্ততঃ সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে।

৫। জগৎ কি, মানুষ কি, কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, মানুষ কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে, বাঁচিয়া কি করা কর্ত্তব্য, কিসে প্রকৃত আত্মোন্নতি হয়, পরিশেষে কেমন করিয়া মরে, এবং মৃত্যুরপরে মানবজীবনের পরিণাম কি হয়, এই গুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে।

৬। দিবা নিদ্রা পরিহার করিবে।

৭। লঘুপাক ভোজ্যবস্তু আহার করিবে। রাত্রে পেট ভরিয়া খাইবে না। পানের পরিবর্ত্তে অনেকবার হরিতকী চিবাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে সচেষ্ট রহিবে এবং তাহার জন্য রাত্রে শয়নকালে এবং প্রত্যুষে উঠিয়া পরিষ্কার এবং শীতল জল পেট ভরিয়া পান করিবে।

৮। প্রগাঢ় নিদ্রা হইলে নিদ্রাকালে, কুপ্রবৃত্তির উদয় বা ঐন্দ্রিক উত্তেজনা হয় না। তজ্জন্য রাত্রির শয়নকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম এবং ভগবচ্চিন্তা করিয়া শয়ন করিবে।

৯। প্রাণায়াম ধাতু বিকৃতির মহৌষধ। প্রাণায়ামযোগীর হৃদয় হইতে কুপ্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে দূরে পলায়ন করে। মস্তিষ্ক পরিষ্কার, শরীরের লঘুতা, নিদ্রার অল্পতা ও প্রগাঢ়তা,

চিত্তের দৃঢ়তা প্রভৃতি অনেক সদ্গুণ প্রাণায়ামদ্বারা লাভ করা যায়; কিন্তু সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহার তাহার নিকট শিখিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রসব করে।

১০। নিজে অপবিত্র থাকিয়া এবং অপবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনা করিবেনা।

১১। অনাস্থাবান, অবিশ্বাসী, অধর্ম্মী, (কুকার্য্যে নিরত) বিধর্ম্মী, কুতার্কিক, কুটিলবুদ্ধিমান, অবিদ্যান প্রভৃতির সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিবে না; কিন্তু জাতি ধর্ম্ম, ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সুযোগ বুঝিয়া সৎ উপদেশ প্রদান করিবে।

১২। কলিযুগে দান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া পরমার্থধন ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করিবে।

১৩। অন্ত্যজের নিকট হইতে শিল্প কৌশলাদি শিক্ষা করিবে, কিন্তু ধর্ম্ম উপদেশ শিক্ষা করিবেনা।

১৪। আপনাকে কখনও হীন বলিয়া মনে করিবে না।

১৫। শত্রুকে কখনও দুর্ব্বল মনে করিয়া অবহেলা করিবে না। ব্যাধি এবং কুপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শত্রু।

১৬। অপবিত্র অবস্থায় এবং অপবিত্রজন কর্ত্তৃক প্রস্তুত অপবিত্র আহার্য্য আহার করিবেনা।

১৭। দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন না করিয়া কিছুই আহার করিবেনা।

১৮। আহারের পরে, মধ্যরাত্রে, দুর্ব্বল শরীরে স্নান করিবেনা; অজ্ঞাত অথবা অপবিত্র কিম্বা অত্যন্ত অস্বচ্ছ সলিলে স্নান করিবেনা।

১৯। দেব-প্রতিমা, পিত্রাদি গুরুজন, রাজা, স্নাতক গৃহস্থ, উপনেতা, কপিলা গাভী এবং দীক্ষিতব্যক্তি ; ইহাদিগের চ্ছায়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও অতিক্রম করিবেনা।

২০। উভয়দিকস্থ গুরুজন, গুরুশিষ্য, স্বামী স্ত্রী, ব্রাহ্মণও অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিবে না।

২১। প্রভাতে, সায়ংকালে এবং উভয় সন্ধ্যায় ও রাত্রে বা দিবার মধ্যভাগে চতুষ্পথে অধিক সময় বিলম্ব করিবে না।

২২। গায়ের মলা, স্নানের জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, বমন, চর্ব্বিত পরিত্যক্ত তাম্বুলাদি, এই সকল দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মাড়াইবে না।

২৩। স্বার্থ সাধনের জন্যও শত্রু, শত্রুর সহায়, চোর, অধার্ম্মিক, কিংবা পরস্ত্রীর সেবা করিবে না।

২৪। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ও অবমাননা করিবে না।

২৫। অর্জ্জন হইতেছে না দেখিয়া আপনাকে হতাদর করিবে না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। শ্রীলাভ দুর্লভ নহে।

২৬। সত্যকথা বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না; অথবা প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না।

২৭। ভদ্রাভদ্র সর্ব্বস্থলেই সর্ব্বদা ভদ্র, পুণ্য প্রশান্ত, ভাল ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাক্য প্রয়োগ করিবে।

২৮। অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, স্থবির, রূপহীন, নির্ধন, অথবা হীনজাতি ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব দোষ উল্লেখ করিয়া উপহাস করিবে না।

২৯। উচ্ছিষ্ট শরীরে গাভী, ব্রাহ্মণ, অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না।

৩০। অসুস্থাবস্থায় কিম্বা অশুচিশরীরে আকাশে জ্যোতিষ্ক দর্শন করিবে না।

৩১। সর্ব্বদা মঙ্গলাচার যুক্ত হইবে, এবং অন্তরে বাহিরে পবিত্র থাকিবে।

৩২। সর্ব্বজীবে সর্ব্বদা মিত্রতা প্রদর্শন করিবে।

৩৩। মঙ্গলাচারযুক্ত, নিত্য সংযতাত্মা, জপ, হোমকারী-জনের গ্রহপীড়া বা দৈবোৎপাৎ হয় না।

৩৪। বিশেষ গুরুজন ব্যতীত যাহার তাহার পদধুলি গ্রহণ করিবে না।

৩৫। গুরু ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট আহার করিবে না।

৩৬। স্নান, দন্তধাবন, বেশভূষা সম্পাদন, দেবতাদিগের পূজা, দিবার পূর্ব্বভাগে সম্পাদন করিবে।

৩৭। যাহা পরবশ, তাহা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। যাহা আত্মবশ, তাহা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবে। পরাধীনতাই দুঃখ, এবং স্বাধীনতাই সুখ; সুখ ও দুঃখের এই সাধারণ লক্ষণ জানিবে।

৩৮। যাহা করিলে চিত্তে প্রসাদ অর্থাৎ আনন্দ অনুভব হয়, তাহাই করিবে। যাহাতে আত্মগ্লানী হয়, তাহা করিবে না।

৩৯। আচার্য্য, গুরু, মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ, গাভী, তপস্বী, প্রভৃতিকে কখনও অশ্রদ্ধা করিবে না। কায়মনোবাক্যে তাহা-দের সন্তোষ উৎপাদনে সচেষ্ট হইবে।

৪০। জীব মাত্রকেই হিংসা করিবে না।

৪১। নাস্তিকতা, দেব-নিন্দা, দেব-কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, লোভ, পারুষ্য একেবারেই বর্জ্জন করিবে।

৪২। শিষ্য, পুত্র এবং শাসনাধীনজন ব্যতীত কাহাকেও দণ্ড দিতে উদ্যত হইবে না।

৪৩। অর্জ্জনে অসমর্থ হইলেও কুপন্থায় জীবিকার্জ্জন করিবে না।

৪৪। যতদিনেই হউক অধর্ম্মের এবং ধর্ম্মের ফল প্রসব করিবেই। ধর্ম্মের ফলে আয়ু, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও শক্তি সংগ্রহ হয়; অধর্ম্মের ফলে সমূলে বিনাশ হয়; ইহা জানিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ করিবে।

৪৫। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দশ জনের আক্রোশ ভাজন হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিবে।

৪৬। হস্ত, পদ, নেত্র ও বাক্যের চপলতা ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ বৃথাকার্য্য বা বৃথা বাক্যব্যায় করিবে না।

৪৭। ন্যায়পরায়নতা, সৎসাহসিকতা, লাভে উপেক্ষা, চিন্তাশীলতা, সদালাপ, সৌন্দর্য্য, সরলতা, স্বাধীনতা, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, স্বাস্থ্য, চিত্তপ্রসন্নতা, মিষ্টবাক্য, ক্ষমা, সদ্ব্যাববহার, সৎস্বভাব, সৎগ্রন্থ, সচ্চিন্তা, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব, ভক্তি, প্রেম, শান্তি প্রভৃতি সদ্গুণের আদর করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জন করিবে।

৪৮। পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, কাম, ক্রোধ,

লোভ, মদ, মাৎসর্য্য আলস্য, বাচালতা, রঙ্গরস, কপটতা, কুটিলতা প্রভৃতি অসৎগুণ গুলিকে ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করিবে।

৪৯। ইন্দ্রিয় দমনেই বীরত্ব, সত্যবলাই বাগ্মীতা, ধার্ম্মিকই পণ্ডিত, স্বার্থত্যাগীই কর্ম্মি ও জ্ঞানী, সন্তুষ্টতাই ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তিই আয়ু, সরলতাই সৌন্দর্য্য।

৫০। ভগবদ্ভক্তই শক্তিশালী, ভগবদ্ভক্তিই শিক্ষার সার, ভগবত্তত্ত্বই জ্ঞানের লভ্য, ভগবৎসেবাই কর্ম্মের শেষ, ভগবৎ-প্রেমই আনন্দের সীমা, ভগবৎগুণগানই কর্ত্তব্যের চরম, ভগবন্নাম প্রচারই দানের শ্রেষ্ঠ।

জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নাম ॥